ISSN 0036-374X

সমতট প্রকাশন

176

বহুবৃত্তিক সমতটের 44 বর্ষপূর্তি সংখ্যা ❑ মূল্য 30 টাকা

এ বারের প্রবন্ধ

কুচবিহার রাজ্য ও ব্রাহ্মসমাজ : ইতিহাসের সংকেত সন্ধানে / এণাক্ষী মজুমদার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ অবদান - ভিন্ন ভাবনা / দেবনারায়ণ ইন্দু
রবীন্দ্রনাথের কৃষিদর্শন : মূল্যায়ন ও প্রাসঙ্গিকতা / দেবারতি জানা
বিবেকানন্দের উৎস সন্ধানে / আলোক চট্টোপাধ্যায়
হারিকেন স্যান্ডি এবং পারমাণবিক বিজ্ঞান / সমর বাগচী

গল্প/রম্যরচনা

আনন্দ সেন কালাচাঁদ ঘোষ সুপ্রিয় দত্ত

বিভাগীয় রচনা

আমার বই পড়া - আমার মনের বই-তরণী / মীনা দাঁ
পুস্তক পর্যালোচনা / অভিজিৎ মুখার্জি

কবিতা

মধুমিতা রুদ্র শশাঙ্ক শেখর পাল বিবেক কবিরাজ কৌশিক দাশগুপ্ত পায়েলী ধর

প্রচ্ছদ শিল্পী : চিত্তপ্রসাদ
মাস্টহেড : পূর্ণেন্দু পত্রী ও বিপুল গুহ

Samatat : 176 ❑ April-June 2013 ❑ 172 Rash Behari Avenue, Kolkata-29 ❑ ₹ 30

সমতট :
176
এপ্রিল-জুন 13

সম্পাদক মণ্ডলী : এণাক্ষী মজুমদার স্নিগ্ধা সেন ছবি কুণ্ডু দেবকুমার সাহা মনোজ রায় মধুমিতা রুদ্র অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত **উপদেষ্টা মণ্ডলী :** অভিজিৎ মুখার্জি ভাস্কর বসু সুমিতা চক্রবর্তী পিনাকী ভাদুড়ী দেবনারায়ণ ইন্দু দীপংকর লাহিড়ী রাজনারায়ণ ইন্দু অভীপ্রসূন চট্টোপাধ্যায় সুব্রত কুমার ঘোষ মীনা দাঁ অরুণ চক্রবর্তী অয়ন ঘোষ। **সভাপতি :** এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় 535

সিধে কথা / ছবি কুন্ডু

প্রবন্ধ

কুচবিহার রাজ্য ও ব্রাহ্মসমাজ ঃ ইতিহাসের সংকেত সন্ধানে / এণাক্ষী মজুমদার 537

হারিকেন স্যান্ডি এবং পারমাণবিক বিজ্ঞান / সমর বাগচী 561

বিবেকানন্দের উৎস সন্ধানে / আলোক চট্টোপাধ্যায় 571

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ অবদান - ভিন্ন ভাবনা / দেবনারায়ণ ইন্দু 575

রবীন্দ্রনাথের কৃষিদর্শন : মূল্যায়ন ও প্রাসঙ্গিকতা / দেবারতি জানা 578

যা দেখেছি, যা পেয়েছি : কলকাতায় যাঁদের দেখলাম / কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত 589

গল্প/রম্যরচনা

ছেলের মতো / কালাচাঁদ ঘোষ 595

লক্ষ্মণ রেখা / আনন্দ সেন 602

প্রজাপতির নির্বন্ধ / সুপ্রিয় দত্ত 613

বিভাগীয় রচনা

আমার বই পড়া-আমার মনের বই-তরণী :

যুদ্ধ ও উলুখড়ের ছেলেবেলা / মীনা দাঁ 617

পুস্তক পরিচয়

একটি অনন্য জীবন : এক স্মৃতিভ্রষ্ট ভারতীয় / অভিজিৎ মুখার্জি 632

কবিতা 639-642

মধুমিতা রুদ্র শশাঙ্ক শেখর পাল বিবেক কবিরাজ

কৌশিক দাশগুপ্ত পায়েলী ধর

চিঠি / অলকা বন্দ্যোপাধ্যায় 643

প্রচ্ছদ শিল্পী : চিত্তপ্রসাদ পূর্ণেন্দু পত্রী বিপুল গুহ

পূজা সংখ্যায় থাকছে ড. সুদক্ষিণা ঘোষের ব্রাত্য জীবনের বর্ণমালা : বিনোদিনী দাসী

পত্রিকার চাঁদার/দানের হার

সমতট সংস্থা : পেট্রন—25,000 (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 100,000 টাকা); পেট্রনরা বিনামূল্যে সমতটের সমস্ত অধুনা প্রকাশিত বই ও পত্রিকা পাবেন।

ত্রৈমাসিক সমতটের 'আজীবন সদস্য' চাঁদা : দেশে 5,000 টাকা; **বিদেশে** 15,000 টাকা। অধিকার : বিশেষ আজীবন সদস্যরা বিনামূল্যে ত্রৈমাসিক সমতট পত্রিকা এবং 25% হ্রাসমূল্যে সমতটের সব বই পাবেন।

স্বদেশে : প্রতিষ্ঠানগত সদস্য চাঁদা : 1/2 বছর—190 টাকা/380 টাকা।

ব্যক্তিগত সডাক গ্রাহক চাঁদার হার : 2 বছর/3 বছর—250 টাকা/380 টাকা।

ব্যক্তিগত (অফিস থেকে হাতে নিলে) : 2 বছর/3 বছর—160 টাকা/250 টাকা।

চাঁদা, ফোন নং ও ডাক-ঠিকানা সহ কমপক্ষে ২ বছরের জন্য পাঠাবেন।

চাঁদা সরাসরি আমাদের UCO Bank-এর SB A/c-যে পাঠাতে পারেন—সেক্ষেত্রে আলাদা চিঠিতে নাম, ফোন নং, ঠিকানা সহ কতো টাকা, কবে পাঠিয়েছেন জানাবেন।

দেশের গ্রাহকরা পাঠাবেন SB A/c 14810100004365 (Samatat Prakashan)-য়ে।

লেখকদের প্রতি নিবেদন

- রচনার মাথায় 'কেবল সমতটের জন্য' কথাটা এবং রচনার নিচে স্পষ্টাক্ষরে লেখকের নাম, স্বাক্ষর, ঠিকানা ও ফোন নম্বরসহ থাকা বাঞ্ছনীয়।
- রচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পিঠে, বাঁদিকে অন্তত দেড় ইঞ্চি মার্জিন ছেড়ে টাইপ করে বা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। *গদ্য রচনার ক্ষেত্রেই* শুধু মোট শব্দ সংখ্যা উল্লেখ্য। নকল রেখে রচনার মূল কপি পাঠানো বাঞ্ছনীয়।
- ত্রৈমাসিক সমতটে প্রকাশিত যে কোনো রচনা বা চিত্র বিনামূল্যে সমতটের কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত করার অধিকার সমতটের থাকবে।
- প্রবন্ধের শেষে প্রাসঙ্গিক উল্লেখপঞ্জি এই ক্রমানুসারে দিতে হবে : (ক) লেখকের নাম, (খ) বই/রচনার নাম, (গ) প্রকাশকের নাম, স্থান ও প্রকাশ কাল, (ঘ) পুস্তক হলে মূল্য।
- কবিতা পাঠাবার ঠিকানা : দেবকুমার সাহা, 11/4 সি, জয়কৃষ্ণ পাল রোড, কলকাতা - 700 038; স্নিগ্ধা সেন, 89বি, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলকাতা-29

সমতটের দাতাদের ধন্যবাদ

এপ্রিল 2013 থেকে জুন 2013 সময়কালে সমতট দফতরে প্রাপ্ত দান :

প্রকাশন বিভাগ

কিশোর মারোদিয়া – ₹ 1,500/-, অর্ঘ্য দত্ত – ₹ 2,250/- ,

সুমিতা চক্রবর্তী – ₹ 2,000/-

(বি. দ্র. : ভারতীয় দাতারা তাঁদের PAN No. জানাবেন।)

সমতট, 172 রাসবিহারী এভিনিউ, **নন্দনা** 302, কলকাতা-700 029

ফোন - TATA 6561 9870, **মোবাইল** - 9830 4589 33, **BSNL** - 2466 5590

সিধে কথা

গান্ধিজি একটা ভবিষ্যৎদর্শী কথা বলেছিলেন - 'প্রকৃতি সাধারণ মানুষের (need) মেটাতে পারে, কিন্তু লোভী মানুষের লোভ (greed) মেটাতে পারে না।'

প্রাচীন যুগ থেকেই ভবিষ্যতের প্রয়োজন বা বিপদের কথা মাথায় রেখে সাধারণ মানুষ সঞ্চয় করে আসছে - দরিদ্র ও মধ্যবিত্তরা লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি ব্যাঙ্ক বা আর্থিক সংস্থায়, আর ধনী ব্যক্তিরা রাখছে সুইস ব্যাঙ্কেও। ব্যক্তিগত ক্ষমতা / প্রয়োজনের সীমা পার হয়ে সীমাহীন লোভ চালিত হয়ে পুঁজিবৃদ্ধির গোলক ধাঁধায় ঘুরছে মানুষ। আশি-নব্বইয়ের দশক থেকেই এ রাজ্যে জীবন ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে এক গভীর সংকট সৃষ্টি হয়। রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ছোট, বড়, মাঝারি কলকারখানাগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যেতে থাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে। গণতন্ত্রের আড়ালে চলতে থাকে জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ফলপ্রসূ বুনিয়াদি কাজের স্থান গ্রহণ করে স্লোগান-সর্বস্ব দিশাহীন ছন্নছাড়া কাজকর্ম। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, প্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা - সর্ববিধ উন্নতির প্রচেষ্টা দিশাহীন - রাজনীতির দুষ্টচক্রে স্তব্ধ হতে থাকে। বন্ধ কলকারখানার জমিতে বা পুকুর ও জলাভূমি বুজিয়ে, পরিবেশরক্ষার তোয়াক্কা না করে গজিয়ে ওঠে বিশাল বিশাল হাউসিং কমপ্লেক্স। রিয়েল এস্টেট, হোটেল, রিসর্ট ইত্যাদিই হয়ে ওঠে রাজ্যের আর্থিক বৃদ্ধির একমাত্র পথ। এই মেকি উন্নয়নের সাথে সাথেই বিশ্বায়নের 'আধুনিকতা' সর্বস্তরের মানুষকে গ্রাস করে ফেলে। আলো-ঝলমলে শপিং কমপ্লেক্স ও মাল্টিপ্লেক্সের দৌলতে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসে ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে। পোশাক-আসাক, খাদ্য, বিনোদনেও হয় রুচির পরিবর্তন। ধনী-স্বল্প বিত্ত সকলেই চায় ট্রেন্ডি পোশাক, জাংক ফুড ইত্যাদি। ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, খেলাধূলা, দেশী শিল্প, কলা, সংস্কৃতি। নব্যধারার সঙ্গে তাল মেলাতে না পারায় সমাজে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে অশিক্ষা, অভাব, দুরাচার ও দুর্নীতি। শ্রমবিমুখ মানুষ বেকারভাতাসহ বিভিন্ন ভাতা, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। সাবলম্বী হবার ইচ্ছাটাও হারিয়ে ফেলছে।

সমাজের যে কোনো দুরাচারের মোকাবিলা করার জন্য নিরপেক্ষ ও দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। এ জন্য সরকার ও রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান (নির্বাচন কমিশনের মতো) তৈরি করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। তাছাড়া শিশু-কিশোর বয়স থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থাতে দেশের সংবিধান ও পরিবেশ -সচেতনার বিষয়ে পাঠ থাকা জরুরি। কোনো সংকটই সমাধানহীন নয়। সমাধানের জন্য

চাই সদিচ্ছা, সঠিক সমাধান চিন্তা, পরিশ্রম। যোগ্যতা ও স্বচ্ছতা দিয়ে মানব-বিকাশের সুষ্ঠু পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ব্যবস্থা বিশেষ সাফল্য লাভ করেনি। এ বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টা থাকা দরকার। গ্রামীন ব্যাঙ্ক ও সফল সমবায় প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগ, কয়েক দশক আগের সঞ্চয়িতা ও এখনকার সারদা কেলেঙ্কারির থেকে দরিদ্র ও স্বল্প শিক্ষিত গ্রামবাসীদের রক্ষা করে তাদের প্রয়োজন মেটাতে অনেকদূর এগোতে পারে। শুধু গ্রামীন ব্যাঙ্ক হয়তো সবটা পারবে না।

পরিশেষে বলি, যেখানে রাজনীতিতে রাজধর্ম পালনের চেয়ে পার্টি প্রাধান্যেরই গুরুত্ব বেশী সেখানে আদর্শ ও সততার দৈন্যদশাই ভবিতব্য। সেজন্য ভারতে আজ দরকার নীতিপরায়ণ ও পরিশ্রমী রাজনীতিবিদ্। এ বিষয়ে চেষ্টাটা শুরু করা দরকার ভোট প্রার্থীদের আইনগত চ্যুতি ও আর্থিক নীতিপরায়ণতাকে নির্বাচন-যোগ্যতা বাছাইয়ের সময় অধিকতর মান্যতা দিয়ে। প্রয়োজনে সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে।

প্রসঙ্গত রাষ্ট্রনীতিবিদ ডেভিড অলিভারের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করছি - "Self regulation can be more effective device for controlling activity than externally imposed regulations"। তবে আমাদের দেশে হয়তো প্রথমদিকে আইন প্রণয়নই দরকার।

আর আমাদের কাঙ্খিত পরিবর্তন শুধু সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। চিন্তাশীল, সমাজসচেতন কর্তব্যবোধসম্পন্ন সকল নাগরিককে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ নিয়ে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। মননশীল পাঠকদের কাছে দিশা চাইছি।

ছবি কুন্ডু

কুচবিহার রাজ্য ও ব্রাহ্মসমাজ : ইতিহাসের সংকেত-সন্ধানে

এণাক্ষী মজুমদার

অধুনা-লুপ্ত কুচবিহার রাজ্যের ইতিহাস নয়, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসও নয়। বরং একটা গল্পই, যা ইতিহাস হয়ে উঠতে পারত। ইতিহাসের চরিত্রগুলিকে চিনতে পারি, ঘটনার পারম্পর্য চিহ্নিত করাও অসম্ভব হয় না, কিন্তু যার উপরে গড়ে ওঠে ইতিহাসের অবয়ব, তেমন দলিল-দস্তাবেজের বনেদ পাই কোথায়?

তিনটি অপ্রকাশিত চিঠি সম্বল। কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর (1862–1932) লেখা চিঠি তো ইতিহাসেরই বিষয়। চিঠি নামক নিঃশব্দ সংলাপের একপ্রান্তে যদি মহারানী সুনীতি, অন্যপ্রান্তে সাধারণী কুমুদেন্দু দেবী (1876–1948) তিনিও ইতিহাসের চরিত্র। সমাজের ইতিহাস এক বর্ণময় মোজাইক; হারানো পাথরকুচির মতো অতীতের জীবনগুলি জুড়ে জুড়েই না ইতিহাস নামক মোজাইকের ছবির পূর্ণতা।

চিঠির সংকেত ধরে ইতিহাস খুঁজি। কিন্তু ইতিহাস হয় না, ইতিহাস লেখার উপাদানের অভাবে। শিরায় শিরায় কুমুদেন্দুর রক্তের রেশ, অনুভব করি। স্মৃতি ধরে রাখে অস্পষ্ট, অতীতকালের ধূসরপ্রায় পটচিত্র, শ্রুতির রেখায় রেখায় টানা।

কুমুদেন্দু-কন্যা জ্যোতিরিন্দু দেবী (1894–1983) আমার পিতামহী। জ্যোতিরিন্দুর আঁচলে আঁচলে আমার জীবন, আশৈশব। কত স্মৃতির কাহিনী। কত শ্রুতির কথামালা। যে বয়সে পৌঁছে জ্যোতিরিন্দুর স্মৃতিকথা আর পারিবারিক শ্রুতিনিচয় ইতিহাসের আকর-উপাদান বলে চিনতে শিখব তার বহুকাল আগেই স্মৃতি-বোধ-ভাষা হারিয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। লিখে রাখা হয়নি কিছুই। বহুকালের সঞ্চিত সব স্মৃতি আর শ্রুতির অবশেষ নিয়ে আমার চারণী-গাথা। হয়তো-বা কিছু আত্মগত (subjective), কিছু খন্ডিত-বা।

গবেষণাজাত ষোল-আনার ইতিহাসের অভাবে, সেই ধূসরতার আদলটাকে চিনে নিতে চারণীর গাথাতে ধরা থাকুক ইতিহাসের সংকেত।

1. কুচবিহারের ব্রাহ্ম-অতীত : একটি ব্যর্থ উদ্যোগের বিষাদগাথা

রাজ্যের নাম কুচবিহার অথবা কুচ-বেহার (Cooch-Behar)। ব্রিটিশ বাংলার অন্যতম দেশিয় রাজ্য (আরেকটি হল ত্রিপুরা। বাকি যত রাজা-মহারাজা সবই আসলে জমিদার)। আঠারো-শো আশির দশক থেকে রাজতন্ত্রের অবসানের দিন পর্যন্ত

(1949) ব্রাহ্মধর্ম ছিল এ রাজ্যের রাজার ধর্ম, রাষ্ট্রধর্ম (state religion)। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ (রাজত্বকাল : 1863–1911) ব্রাহ্ম ছিলেন। 1903-এ প্রকাশিত রাজ্যের বৃত্তান্তে লেখা হয়েছে :

> His Highness belongs to the New Dispensation Church of the Brahmo Samaj, and all the domestic ceremonies in his family, such as *Nama-Karana, Diksha,* marriage are regulated by the tenets of that creed.

মহারাজা, স্ব-রাজ্যে এবং অন্যত্র ধর্মপ্রচারের জন্য দরাজ হাতে অর্থ ব্যয় করেছেন বলেও এই সূত্রে জানা যায়।[1]

রাজ্যের সমনামা রাজধানী, অধুনা জেলা-সদর কুচবিহারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'এশিয়ার বৃহত্তম' সমাজ-মন্দির (1888) এবং ব্রাহ্মধর্ম রাষ্ট্রধর্ম বলে ঘোষিত হয়েছিল।[2]

ব্রাহ্মসমাজের সর্বশেষ ভাঙন ও তৎকালে বহুনিন্দিত 'কুচবিহার বিবাহে'র আগেও কুচবিহার শহরে ব্রাহ্ম উপাসক-মণ্ডলী ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর সংকলিত তথ্য অনুসারে কুচবিহার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময়টি হল 1873/1875। রাজ্যের প্রশাসনের ছোট-বড় পদে, স্কুল-কলেজ-হাসপাতালে চাকরি নিয়ে যাঁরা আসতেন, তাঁরাই এ রাজ্যে ব্রাহ্মধর্মের বাহক, অনুমান করি। বেশি কথা কি, প্রায় অর্ধ-শতাব্দকাল রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন কালিকাদাস দত্ত, সেকালের একজন বিখ্যাত ব্রাহ্ম (পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ)। ইনিই বোধহয় কুচবিহারে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মূলে।[3]

1883-এ সাবালকত্ব লাভ করে রাজ্যের কর্তৃত্ব হাতে পেলেন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ, সেই সময় থেকেই রাজ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠার বহুতর উদ্যোগ। বলা বাহুল্য হবে, সেটি নববিধান ধর্ম। আদি ব্রাহ্মসমাজ তার অনেক আগে থেকেই বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের পারিবারিক সমাজে পরিণত। 'কুচবিহার বিবাহে'র সূত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কুচবিহার রাজ্যে সেই সমাজেরও পৃথক উপাসনা-মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। তাহলেও, কুচবিহারের ব্রাহ্মসমাজ বলতে কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান সমাজকেই বোঝাত।

ব্রাহ্ম মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ, ব্রাহ্মিকা মহারানী সুনীতির রাজত্বে কুচবিহারে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে খামতি ছিল না। স্থায়ী আচার্য ছিলেন। নিযুক্ত হয়েছিলেন স্থায়ী প্রচারক ও গায়ক। কলকাতার কেন্দ্র থেকে প্রচারকদের আসা-যাওয়া ছিল। ভ্রাম্যমান প্রচারকদের জন্য নির্দিষ্ট আবাস স্থাপিত হয়েছিল। শহরের উপকণ্ঠে তোর্ষা নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নির্জন-সাধনের কেন্দ্র কেশবাশ্রম (1889)। ঋতুতে ঋতুতে ব্রহ্মোৎসব হত। মাঘোৎসবের ঘটা ছিল। কেশব-জয়ন্তী পালিত হত। 'ভগ্নীদলে'র পৃথক মণ্ডলী ছিল। ছিল তাঁদের 'আনন্দমেলা' (আনন্দ-বাজার) এবং 'আর্য নারীসমাজ'।

আমরা অবহিত আছি, 'বাবু'দের বাই-নাচানো সংস্কৃতি আর ডিরোজিও-শিষ্যদের উচ্চকিত আধুনিকতার ক্ষণস্থায়ী পর্ব পার হয়ে সুনীতি-পরায়ণ, শুচি-শুদ্ধ, ধীর ও প্রশান্ত বুদ্ধি-বিভাষার নতুন আধুনিকতা এক সময়ে কলকাতার বাঙালি সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। এই নতুন আধুনিকতার মূলে ছিল ব্রাহ্ম আন্দোলন। ধর্মমত হিসাবে ব্রাহ্মধর্মের মত জনপ্রিয় হয়নি, স্থায়িত্ব লাভ করেনি। কিন্তু বাঙালির উনিশ শতকীয় আধুনিকতার উৎসমূলে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা অস্বীকার করার নয়। কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার সূত্রে ব্রাহ্মধর্ম যেমন কুচবিহার রাজ্যে প্রবেশ করল, তেমন নতুন আধুনিকতাও।

> উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাস কুচবিহারকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু কী ছিল কুচবিহার আর কী হল—বিবর্তন-পরিবর্তনের এই ইতিবৃত্ত এখনও নির্মিত হওয়া বাকি। মহারানী সুনীতির ভূমিকা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :
>
> > মহারাজার সঙ্গিনী রূপে তিনি রাজ্যের বহু উন্নতিসাধন করেন। প্রজাদের ভিতর স্ত্রীশিক্ষা, মাদকতা নিবারণ, জনসেবা ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের সংস্কারসাধন করেন। কলকাতার যশস্বী শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও অধ্যাপকদের কুচবিহার কলেজ ও বিদ্যালয়ে এনে রাজ্যে শিক্ষার ও বাংলা ভাষার ব্যবহারের প্রবর্তন করেন। বহু যোগ্য বাঙালি কর্মচারীকে এনে রাজ্যশাসন ব্যবস্থার উন্নতি করেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, কীর্তনীয়া ও বক্তাদের এনে উৎসব, কীর্তন, কথকতা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করে রাজ্যে ধর্মচেতনার সৃষ্টি করেন।[4]

যে কথাটা আগে বলেছি, ব্রাহ্মধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আধুনিকতার প্রসারের কথা, সতীকুমারের বিবরণে তার সমর্থন মিলছে।

ডেভিডক ফ' কুচবিহারবি বাহে'রএ ই পরিণতিরদি কেদ্ৃষ্টিঅ াকর্ষণক রেছেন, একটি পশ্চাদপর প্রান্তিক দেশিয় রাজ্যের সেরকম রূপান্তরের দিকে।[5] অবশ্য এটাও সত্য যে, মহারাজা ও মহারানীর ব্যক্তিগত আনুকূল্যে ও উদ্যোগে আঠারো-শো আশির দশক থেকে আধুনিকীকরণের যে প্রক্রিয়া দ্রুতগতি হয়েছিল, তার সূচনা দু-দশক আগেই, মহারাজার নাবালকত্বে। এই আধুনিকীকরণের হোতা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে বাংলার ছোটলাটবাহাদুর। রূপকার কর্নেল জে. সি. হটন। নৃপেন্দ্রনারায়ণ যখন দুধের শিশু, তখন থেকেই ইনি বাংলার ছোটলাটের পক্ষে কুচবিহার দরবারের বিবদমান শক্তিগুলিকে, রাজ্যের প্রশাসন ও শিশু মহারাজাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। বহু যত্নে ইংরেজি ধরনের আধুনিকতা কুচবিহার রাজ্যে এনে ফেললেন হটন। সেরকম আধুনিক সংস্কারের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতেই তো নাবালক মহারাজাকে তাঁর অভিভাবিকাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখানো, বিলেত পাঠানো, বিলেত পাঠানোর আগে রাজমাতাদের

তুইয়ে-বুইয়ে, দরবারকে অপ্রসন্ন করে শিক্ষিত 'ভাটিয়া' অ-কুচবিহারি বাঙালির মেয়ে খুঁজে এনে বিবাহ দান। নাবালক মহারাজার মনে ব্রিটিশ সুশাসনের আদরাটি ছকে দিয়ে দাগে দাগে পা মিলিয়ে চলতে প্ররোচিত করা। (অনেকানেক ছোট-বড় দেশিয় রাজ্য থাকতে কেনই-বা কুচবিহারকে নিয়ে, একমাত্র কুচবিহারকে নিয়েই, ব্রিটিশ সরকারের এত মাতামাতি তার কারণ সম্বন্ধে এক প্রকল্প খাড়া করেছি। আশা, সময়ান্তরে তা প্রকাশ করতে পারব।)

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ তাঁর ব্রিটিশ অভিভাবকদের আশা পূর্ণ করেছিলেন বইকি। ভারতের অন্য অনেক, বলা ভালো অধিকাংশ, দেশিয় রাজ্যের মতো লাগামছাড়া শোষণ কুচবিহারে ছিল না। অন্যদিকে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্রিটিশ ভারতের জেলা শহরগুলি ও অধিকাংশ দেশিয় রাজ্যের জনপদগুলির তুলনায় কুচবিহার এক আদর্শ স্থান হিসাবে পরিচিত হতে থাকে উনিশ শতকের শেষদিক থেকে। আর সংস্কৃতির দিক থেকেও কুচবিহারের নিজস্বতা ছিল।

কিন্তু লৌকিক স্তরে ব্রাহ্ম সংস্কৃতি-শুচিতা আত্মস্থ করতে উৎসাহী হলেও কুচবিহারবাসী ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে উদাসীন, অনাগ্রহী, কখনও কখনও যেন বিদ্বিষ্টই ছিল। এও এক বিস্ময়কর সত্য। একেশ্বরবাদ কুচবিহারে জনপ্রিয় হয়নি। তা হয়তো মাটির গুণে। বহুকাল আগে 'মহাপুরুষ' শঙ্করদেব (1449–1568) 'বেহাররাজ' নরনারায়ণের (1534–1585) রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রাচীন কামরূপ-কামতার পশুবলিদানকারী শৈব-শাক্ত সমাজের অসহ্য হয়েছিল শঙ্করদেবের 'একশরণ-ধর্ম' অর্থাৎ 'কৃষ্ণজ্ঞানে উপাসিত' নিরাকার পরব্রহ্মের আরাধনা ও জাতিপ্রথা অস্বীকার। কালে শঙ্করদেবের অন্যতম শিষ্য শ্রীমন্ত মাধবদেব ও দামোদরদেব তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ও জনসাধারণ এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক রাজশক্তির উৎপীড়নে 'বেহার' রাজ্যে আশ্রয় নেন। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ (1587–1627) 'মাধবর ধর্মে' দীক্ষিত হন। 'মাধবর ধর্ম' অর্থাৎ মাধবদেব প্রচারিত নিরাকার বৈষ্ণব সাধনার পন্থাই রাষ্ট্রধর্ম বলে ঘোষিত হয়েছিল। সমকালীন সূত্রের সাক্ষ্য, বৈষ্ণব লক্ষ্মীনারায়ণ জীবহিংসা বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে রাজ্যসুদ্ধ লোককে স্বমতে আনতে শারীরিক নির্যাতন করতেও ছাড়েননি। রাজার তেমন উদ্যোগ সত্ত্বেও বিগ্রহশূন্য 'নামঘরে' নিরাকারের নামসাধন এ রাজ্যে চলল না। বলি বন্ধ হল না। পরব্রহ্ম মদনমোহনের মূর্তিতে রাধাকে ছেড়ে একলাটি ঠাঁই নিলেন রাজ্যের মন্দিরে মন্দিরে। সত্রে সত্রে বিষ্ণু-কৃষ্ণের প্রতিমা স্থাপনে সহায়তা করলেন রাজারা। আসলে যেমন কামরূপে, তেমনই কুচবিহারের মানুষেরও মনের টান ছিল খানিক উপজাতীয় অভিচার, খানিক বৈদিক-পৌরাণিক, খানিকটা তান্ত্রিক মন্ত্রতন্ত্রের মিশেলে তৈরি এক বিশেষ প্রকার ব্রাহ্মণ্যধর্মের দিকে। ষোল-সতেরো থেকে উনিশ শতক-দু-চারশো বছরেও কিছুই বদলায়নি। সাকার উপাসনার যে রক্তাক্ত পদ্ধতি (তা সে বিষ্ণু, শিব বা দুর্গার উপাসনা

হোক) কুচবিহারবাসীর মজ্জাগত, তার সামনে ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার উপাসনা কিছুতেই দাঁড়াতে পারেনি।[৫] অন্যদিকে ব্রাহ্মধর্মের মূলোচ্ছেদের চেষ্টাও যেন ছিল।

ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা তো হয়েছিলই। প্রচারক, কথক, কীর্তনীয়া, আনিয়ে কথকতা, উৎসবাদি পালনের কথাও ঠিক। কিন্তু সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শেষের মন্তব্যটি নিয়েই সংশয়। মহারানী সুনীতির তেমন উদ্যোগ সত্ত্বেও 'ধর্মচেতনা'র সৃষ্টি হয়েছিল কি, যে অর্থে 'ধর্মচেতনা' শব্দটি প্রযুক্ত? নথিভুক্ত পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তাহলেও এরকমই মেনে নিতে হবে যে ব্রাহ্মসমাজের পূর্ণগৌরবের দিনেও (1883–1913) কুচবিহার শহরের মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছিল। শহরের বাইরে ব্রাহ্মধর্মের কোনো চিহ্ন ছিল না। শহরের ব্রাহ্মরা সবাই বহিরাগত, বাঙালি ভদ্রসন্তান, অস্থায়ী। চাকরির টানে তাঁদের কুচবিহারে বাস। মহারাজার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে জ্ঞাতিভাই কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ (সিনিয়র, 1857–1921) ছাড়া ব্রাহ্ম কেউ ছিলেন না। নিকটাত্মীয় তো বটেই; উভয়ের প্রপিতামহ হলেন কোচ রাজবংশের ষোড়শ নৃপতি হরেন্দ্রনারায়ণ (1783–1839)। নৃপেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের (1839–1847) পৌত্র, গজেন্দ্রনারায়ণ রাজভ্রাতা মেঘেন্দ্রনারায়ণের। রাজবংশের অন্যান্য শাখায় এবং ভূমিপুত্র কোচ-মেচ-রাভাদের সমাজে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব পড়েনি। রাজ্যের রাজধানী যে কুচবিহার শহর তার সীমানা পেরিয়ে রাজ্যের অভ্যন্তরে, বিশেষত গ্রামীণ সমাজের কাছে ব্রাহ্মসমাজের আবেদন পৌঁছায়নি। অর্থাৎ এ হল একান্তভাবেই এক শহর-কেন্দ্রিক উদ্যোগ, শহুরে মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কুচবিহারের নাগরিক সমাজের সম্বন্ধে দু-এক কথা এখানে বলে নেওয়া দরকার। শহরের স্থায়ী জনগোষ্ঠীর বড় অংশটা ছিল হিন্দু বর্ণসমাজের অন্তর্ভুক্ত। কবে কীভাবে এসে ভূমিপুত্রদের ঠেলেঠুলে সরিয়ে তারা জাঁকিয়ে বসেছিল কুচবিহারে তা জানা যায় না। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলাদেশের সর্বত্র যেমন, কুচবিহারেও তেমন এক অনড়, স্থানু, রক্ষণশীল হিন্দু বর্ণসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভূমিপুত্র কোচদের সমাজে বর্ণাশ্রম প্রচলিত ছিল না, থাকার কথাও নয়। কিন্তু শহরে হোক বা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, কুচবিহারের ভূমিপুত্র-সমাজও ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের নিগড়ে বাঁধা পড়েছিল। ষোল শতকে মহারাজা নরনারায়ণ একদল শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কুচবিহারে। আচারনিষ্ঠ এই ব্রাহ্মণসমাজই কুচবিহারের গুরু-পুরোহিত, বিধানদাতা। তাঁরা যেমন বিশুদ্ধ শাস্ত্রসম্মত পূজা-অর্চনার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন তেমনই উপজাতীয় অভিচারের সঙ্গে, লোকায়ত বিশ্বাসের সঙ্গে খানিক আপসও করেছিলেন বললে ভুল হবে না। সেইজন্যই কুচবিহারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মদনমোহনের ভোগে আমিষ চলে, শিবঠাকুর খাসি-পায়রা বলি নিতে আপত্তি করেন না।

তো, এই কুচবিহারি-অকুচবিহারি 'দেশি' আর 'ভাটিয়া' মানষির (অর্থাৎ মানুষ) সম্মিলিত হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছিল বললেই ঠিক বলা হবে। ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে তারা নির্লিপ্ত এবং বিদ্বিষ্ট ছিল। নির্লিপ্ততার প্রমাণ তো এই যে, ব্রাহ্মধর্মের

পূর্ণগৌরবের কালেও কুচবিহার শহরে হিন্দুধর্মের প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। নববিধান সমাজের নেতা কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের এক চিঠি থেকে এর প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। তিনি স্ত্রীকে লিখছেন (চিঠির তারিখ নেই, আনুমানিক 1901–1907-এর মধ্যে লেখা) :

> শুক্রবার থেকে বিষহরি ও ঢাকঢোলের শব্দে প্রাণ গেল। বেহার রাজ্য উচ্ছন্নে গেল।
>
> একদিকে ব্রহ্মদেবী , আর একদিকে কুচবেহার অসুর; কৈ যুদ্ধে অসুরেরই জয় হইতেছে। শেষে অবশ্য অসুরের পতন হইবেক।[7]

'অসুরের পতন' সম্বন্ধে কুমারসাহেবের এই ভবিষ্যবাণী অথবা আশা যে সফল হয়নি তার প্রমাণ খুঁজতে বেশি কষ্ট করতে হবে না। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই একুশ শতকীয় আধুনিকতার শিকড়হীন উদ্দামতার মধ্যেও কুচবিহারের দেশি-ভাটিয়া নির্বিশেষে প্রত্যেকটি হিন্দুই ধর্মগতপ্রাণ সাকারবাদী থেকে গিয়েছে তলায় তলায়। ব্রাহ্মধর্মের, এমনকী, স্মৃতিও অবশিষ্ট নেই। অন্যদিকে, প্রকৃত কুচবিহারি, এমনকী, ইসলামধর্মাবলম্বী কারো সামনেও, বিশেষত, 'মদনমোহনঠাকুর' সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলে ব্যাপারটা সুবিধের হবে না।

বিদ্বেষের প্রমাণ? বিদ্বেষের প্রমাণ তো এই যে, ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করা, ব্রাহ্মিকা মহারানী সুনীতি দেবীর সঙ্গে মেলামেশার কারণে কোনো পরিবারকে 'জাতে ঠেলা' করতে পারত হিন্দুসমাজ, করেছিল। কুমুদেন্দু কুচবিহারের হিন্দুসমাজে ব্রাত্য হয়েছিলেন। তাঁর পরিবারটাই। সে কথা যথাসময়ে বলা যাবে।

আমরা অবহিত আছি, কেশবচন্দ্রের কাছে 'কুচবিহার-বিবাহে'র প্রস্তাব এসেছিল 'দৈবাদেশ' রূপে। তার বেশি কিছু তিনি বলেননি। 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু রাজ্যে সমুন্নত ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা'র ইঙ্গিত কি 'দৈবাদেশে' নিহিত ছিল? কেশবচন্দ্র কি এমন আশা করেছিলেন(যএ কটি(দশিয়ব. াজ্যেরব. াজাকেব.াহ্মধর্মেদীক্ষিতক রলেস্বতঃই(স রাজ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রসারিত হবে? জননী সারদাসুন্দরীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন :

> এই বিবাহের জন্য কেশব যাহা সহ্য করিয়াছেন লোকে তাহা পারে না। যে উদ্দেশ্যে কেশব এত সহ্য করিলেন কুচবিহার রাজ্যে তাহা পূর্ণ হোক।[8]

কী সেই উদ্দেশ্য? আমরা তো জানি যে 'দৈবাদেশে'র কথাটা সেকালে তত বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। অভিযোগ উঠেছিল, বিষয়ী এবং হিসেবী লোকের মতো রাজার শ্বশুর হওয়াই কেশবচন্দ্রের অন্বিষ্ট। কিন্তু কেশবচন্দ্র সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাতে তাঁকে আত্মপরায়ণ, অর্থলোভী, ক্ষুদ্রাত্মা বলে মনে করাও কঠিন।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্যই কেশবচন্দ্র এই বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন এরকম বলতে চাইছি না। তা প্রমাণ করাও সহজ নয়। কিন্তু জামাতা নৃপেন্দ্রনারায়ণ যে তাঁর রাজ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের আনুকূল্য করেছিলেন তাও তো সত্য।

ব্যক্তিগতভাবে ধর্মপ্রচার করে বেড়াননি মহারাজা, কিন্তু কুচবিহার রাজ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য যে ব্যবস্থাদি প্রচলিত ছিল, তা কি মহারাজার সম্মতি ও সহযোগ ছাড়া সম্ভব ছিল? কিন্তু প্রচারে ফল হয়নি। কুচবিহারের মানুষ ব্রাহ্মধর্মকে স্বীকার করেনি। কী-বা করতে পারতেন মহারাজা? আগে বলেছি, মহারাজার পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণ প্রজাদের উৎপীড়ন করেও স্বমতে আনতে পারেননি। সে তো সতেরো শতকের কথা আর এ হল উনিশ-কুড়ি শতক। এ সময়ে, ব্রিটিশের করদ-মিত্র মহারাজা কি আর বলপ্রয়োগ করতে পারতেন? বলপ্রয়োগ মানে লক্ষ্মীনারায়ণের মতো নির্যাতন নয়, জিজিয়ার মতো ব্যবস্থাই ধরা যাক। পারতেন না। তাঁর শাসন, প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শাসনের রকমফেরমাত্র। আর, ব্রিটিশ শাসনে যত শোষণ, যত অত্যাচার, যত জাতিবিদ্বেষই থাকুক, তারা মন্দির-মসজিদ ভেঙে গির্জা তোলেনি, খিস্টানি মতে জিজিয়া নেওয়ার ব্যবস্থাও করেনি। 'এড়া রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতিমারা'—এ ব্রিটিশের পলিসির মধ্যেই ছিল না। সুতরাং, ব্রিটিশ ধরনের সুশাসন প্রবর্তনকারী মহারাজার পক্ষে কারও 'কান্ধেস ুতা'ে দখলেব ৃক্ষতলেথ ুইয়াব জ্রকিলম ারাওস ভবছি লন া।এ ইক ারণেই ব্রাহ্মরাজ্য কুচবিহারে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থেকে গিয়েছিল।

রাজদরবারে নিযুক্তি বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মরা কি রাজার কৃপাদৃষ্টি লাভ করত? সেরকম দাবি করার মতো প্রমাণ নেই। তা হয়তো হত। আবার সাধারণ মানুষ যা করুক তা করুক, রাজার কর্মচারীদের কাছে কি ধর্মীয় আনুগত্য গোছের কিছু আশা করা হত? একজনের কথা জানি, যিনি ধর্ম-সংক্রান্ত এক বাদ-প্রতিবাদে জড়িয়ে 'রাজশক্তির কোপে পতিত হন'। তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ, কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক। 1893-এ চাকরি করতে গিয়ে 1894-এ ইস্তফা দেন ইনি। তার অন্যতম কারণ হল (স্থানীয়) ব্রাহ্মদের হিন্দু-নিন্দার প্রতিবাদজাত সমস্যা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''ব্রাহ্মধর্মের নতুন উত্তেজনায় রাজাশ্রয়ে থাকিয়া ব্রাহ্মরা হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও ধর্মের নিন্দা করিতেন।" প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদ করাতেই ললিতকুমার 'রাজশক্তির কোপে পতিত হন' এবং আত্মসম্মান বজায় রাখতে ইস্তফা দেন।[৯] রাজশক্তির কোপের ধরণটা কী তা অবশ্য জানা যাচ্ছে না।

এরকম ঘটনা আরও ঘটে থাকতে পারে। অসম্ভব নয় সেটা। কিন্তু অন্যদিকটাও ছিল। অর্থাৎ কুচবিহারের ব্রাহ্মণসমাজের দ্বারা প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্মের বিরোধিতা। স্থানীয় এক সূত্রের খবর : সেকালের বিখ্যাত হিন্দু প্রচারক পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে আমন্ত্রণ করে কুচবিহারে এনেছিল ব্রাহ্মণসমাজ। ঠিক শহরের মধ্যে নয়, ঘুঘুমারি নামক স্থানে তর্কচূড়ামণিমশায় বক্তৃতা করেছিলেন। কুচবিহারের মানুষ দল বেঁধে সভায় গিয়েছিল।[10] এই ঘটনা আনুমানিক উনিশ শতকের শেষে। অন্য একটি সূত্রে এই বাচিক তথ্যের সমর্থন পাচ্ছি। সেখানেও দিনক্ষণের উল্লেখ নেই। বক্তার নামও নেই। কেবল 'এক সময় একজন বক্তা' ঘুঘুমারিতে এসে 'ব্রাহ্মধর্মের নিন্দা করে'—এই উল্লেখ আছে। তাতে মহারাজা বলেছিলেন, ''সে ব্যক্তির ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে বলা

আমি বন্ধ করিয়া দিতে পারি, কিন্তু রাজ্যে আসা বন্ধ করিতে পারি না।"[11] শেষ পর্যন্ত মহারাজা কী করেছিলেন তা অবশ্য জানা যায় না। এও সামান্য ব্যাপার নয়। রাজরোষের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের হিন্দু প্রজাসাধারণের এই সনাতন ধর্মরক্ষার উদ্যোগ। আরও উল্লেখযোগ্য যে এই ঘুঘুমারি এলাকাটা তখন ছিল সমাজ-নেতা গজেন্দ্রনারায়ণ কুমারসাহেবের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত।

কোনো ইতিহাস-সন্ধানী মানুষের পক্ষে কুচবিহার রাজ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রবেশ, প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও দ্রুত অবলুপ্তির বিষয়টি নিঃসন্দেহে আগ্রহের বিষয় হতে পারে। সেরকম আঞ্চলিক ও স্থানিক বিবরণ সংকলিত হলে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস সম্পূর্ণতা পাবে, তাও সত্য। কিন্তু এ পর্যন্ত কুচবিহারের ব্রাহ্মসমাজ কোনো ঐতিহাসিকের আগ্রহের বিষয় হয়েছে বলে মনে হয় না। ঐতিহাসিক আকর-উপাদানের অভাব কি গবেষকদের হতোদ্যম করেছে? অসম্ভব নয়। কিন্তু এরকম সন্দেহ হয় যে, কুচবিহারের ব্রাহ্ম-অতীতকে অস্বীকার করার প্রবণতাও যেন আছে। স্থানীয় কোনো কোনো গবেষক, ইতিহাসচর্চার প্রথাগত প্রশিক্ষণ না-থাকা সত্ত্বেও, লুপ্তাবশিষ্ট দস্তাবেজগুলি প্রচুর পরিশ্রমে সংগ্রহ ও সমীক্ষা করে রাজ্যের ইতিহাস নির্মাণের এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু এই বিষয়টি, এরকম মনে হচ্ছে, তাঁরা এড়িয়ে এড়িয়ে চলছেন। তার কারণ কি এই যে, ইতিহাসের এক নির্দিষ্ট কালপর্ব থেকে কুচবিহার রাজপরিবারের ভিতর থেকেই ব্রাহ্ম-বিরোধিতার সূচনা হয়েছিল এবং সেসব কথা এইসব স্থানীয় রাজতন্ত্র-ভক্ত লেখকরা লিখতে চান না?

অবশ্য আকর-উপাদানের অভাবের কথাটা তো থাকছেই। আত্মজীবনী লিখেছিলেন সুনীতি দেবী, যা অনায়াসে হয়ে উঠতে পারত কুচবিহার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের দলিল। কিন্তু বিস্ময়কর যে, কুচবিহারে যাপিত জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখলেন মহারাজার সংসারের কথা; সুপুরি কুচোনো, পান সাজা, কুটনো কোটা, আঠারো ব্যঞ্জনে ভাতের থালা সাজানোর কথা। লিখলেন না 11ই মাঘের শোভাযাত্রা, সংকীর্তন, উপাসনা, কথকতা, আনন্দমেলা, আর্যনারীসমাজের অধিবেশনগুলির কথা। নববিধানের ধর্ম ও সংস্কৃতি উদ্দীপনের যত কার্যসূচি।[12]

কিছু কিছু লিখেছেন কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা সাবিত্রী দেবী তাঁর স্বামী কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের স্মৃতিগ্রন্থে। দুষ্প্রাপ্য এই বইটিতে কুচবিহারের ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান তথ্য আছে, ব্রাহ্মধর্মের বিরোধিতা ও ব্রাহ্মধর্মের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধেও। উল্লেখযোগ্য যে, সুনীতি দেবীর আত্মকথায় সাবিত্রী দেবীর বিষয়ে দু-এক লাইন মাত্র আছে আর সাবিত্রী দেবী তাঁর বইয়ে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও সহোদরা সুনীতির সম্বন্ধে, বিশেষ করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সন্দর্ভে, একটি বাক্যও ব্যয় করেননি। সাবিত্রী দেবীর লেখা বস্তুত তাঁর স্বামীর স্মৃতিকথাই, যিনি, সাবিত্রী দেবীর দৃষ্টিতে, কুচবিহারে ব্রাহ্মধর্মের একমাত্র নিশানধারী। তিনি কুচবিহার নববিধান সমাজের সম্পাদক ছিলেন।

কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, মহারাজার জ্ঞাতি, বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার ছিলেন। কেশবচন্দ্রের দ্বারা দীক্ষিত ও উৎসাহী ব্রাহ্ম। কলকাতা হাইকোর্টে কর্মজীবন শুরু করলেও মহারাজার আগ্রহে তিনি কুচবিহারে ফিরে আসেন, রাজ্যের সহকারী সিভিল জজের দায়িত্ব নেন। সাবিত্রী দেবী লিখেছেন, কথা ছিল কয়েক বছর এই পদে কাজ করার পর তাঁকে রাজ্যের সিভিল জজের পদ দেওয়া হবে। কিন্তু মহারাজার ''কতকগুলি সহচর তাঁকে দূরে দূরে রাখিতে চাহিতেন।'' সিভিল জজের পদপ্রাপ্তি হলে গজেন্দ্রনারায়ণ 'কুচবিহার রাজ্যে বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার করেন ও রাজার প্রিয়পাত্র হন'—এই আশঙ্কায় তাঁকে রাজধানী থেকে সরিয়ে চাকলাজাত এস্টেটের অধীক্ষক নিযুক্ত করা হয়।[13] সে চাকরিও বেশিদিনের নয়। 1895-এ অবসর নিয়ে বসে গিয়েছিলেন গজেন্দ্রনারায়ণ। সে যাই হোক, একেবারে গোড়া থেকে 1916 পর্যন্ত গজেন্দ্রনারায়ণই ছিলেন নববিধান সমাজের নেতা ও সংগঠক। কুচবিহারের সমাজমন্দির, কেশবাশ্রম, ব্রাহ্ম বোডিং, ব্রাহ্মপল্লী ও প্রচারকদের আবাস—এসব গড়ে তোলার পিছনে তাঁর ভূমিকার কথা লিখেছেন সাবিত্রী। অন্যদিকে নিয়মিত উপাসনা, উৎসব, শোভাযাত্রা, সংকীর্তন ইত্যাদি নির্বাহ ও সুরাপান নিবারণী সভা, ইয়ং মেন থিস্টিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাতেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁদের বাসভবন 'সাবিত্রী লজ' ছিল কুচবিহারের 'আর্যনারীসমাজে'র সভাস্থল। আয়োজনের কথা আছে ঠিকই, ব্রাহ্ম হয়ে কুমারসাহেবকে যে বহুবিধ সামাজিক বাধাবিপত্তি পার হতে হয়েছিল, তাও লেখা আছে। আর একটা বিষয়ও স্পষ্ট, গোড়া থেকেই দরবারের একটি গোষ্ঠী ব্রাহ্ম-বিরোধী ছিল। কিন্তু কীভাবে, সাবিত্রী দেবীর মতে, ব্রাহ্মসমাজের মূলোচ্ছেদের চক্রান্ত হয়েছিল সে গল্পই আসল।

1911-এ বিলাতপ্রবাসে মৃত্যু হল মহারাজার। গদি পেলেন জ্যেষ্ঠ মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ। নবীন মহারাজা ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে সক্রিয় ছিলেন, এরকম ইঙ্গিত পাচ্ছি। অভিষেক থেকেই শুরু। সুনীতি দেবী লিখেছেন, চিরাচরিত রীতি বর্জন করে নববিধানের অনুশাসন অনুযায়ী অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। পৌরোহিত্য-কর্ম করলেন রাজমাতা স্বয়ং—

> I did the priest's work, for my son would not hear of anyone else assisting him.[15]

এ খুব সামান্য ব্যাপার নয়। একে স্ত্রীলোক, তাতে বিধবা—অভিষেকের মতো শুভকর্মে রাজমাতার পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও হিন্দু আমলাদের অপ্রসন্নতার কারণ হয়ে থাকতে পারে। অন্যদিকে রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের অভিষেক উপলক্ষে যে মুদ্রা প্রস্তুত হয়েছিল (প্রতীকী মুদ্রামাত্র) তাতে রাজবংশের চিরাচরিত রীতি বর্জন করা হয়। কুচবিহারের মুদ্রায় রাজাদের পরিচয় দেওয়া হত শিবচরণকমলের মধুকর বলে। তা, সে 'মাধবর ধর্ম' গ্রহণের পরেও। এঁরা যে শিবের বংশ! রাজ্যের ইতিহাসকার লিখছেন, এই প্রথম রাজকীয় মুদ্রায় শিবের উল্লেখ বর্জিত হল। তার বদলে এল

রাজচিহ্ন (Coat of Arms) এবং ***যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ*** এই শ্লোকাংশ।[16] কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের বিশেষ অভিজ্ঞানের বদলে ভারতবর্ষের শাশ্বত বিশ্বাসের ঘোষণা এই ব্রাহ্ম শাসকের অভিনব প্রয়াস বলা চলে।

আর এক কথা লিখেছেন সুনীতি দেবী ; রাজ্যের কোনো লোকায়ত ধর্মীয় উৎসব তাঁর রুচিবিরুদ্ধ ছিল বলে নৃপেন্দ্রনারায়ণ একসময়ে তা নিষিদ্ধ করেছিলেন। রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ রাজা হয়ে দেখেন সেই উৎসব ও 'অশ্লীল' আচারাদি পালিত হচ্ছে। তখন তিনি দ্বিতীয়বারের মতো তা নিষিদ্ধ করেন।[17] ব্রাহ্মধর্মের প্রসারে এবং হিন্দু পূজা-অর্চনাকে নিয়ন্ত্রণ করতেই বোধহয় মহারাজা আরেকটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সাবিত্রী দেবী লিখছেন, রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ একসময়ে তাঁকে বলেন :

দেবত্তরের টাকা কমাইয়া আমাদের Church-এ (নববিধান মন্দিরে) কিছু দেওয়া যাক, কি বল Aunty। আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, দিলে খুবই ভালো হয়।" তখন হইতে New Dispensation Church-এ 5000/- টাকা মঞ্জুর হইল।[18]

এই নতুন রাজকীয় নীতির বিষয়ে কোনো ঐতিহাসিক দলিলের সন্ধান পাইনি কিন্তু নববিধান সমাজ-মন্দিরের জন্য বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছিল রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের সময়েই, এরকম শোনা যায়। আর, মহারাজা দেবত্র ট্রাস্টের বরাদ্দে কাটছাঁট করার কথা যে ঘোষণা করেছিলেন তা জানিয়েছেন হিমাদ্রিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। বলেছেন, রাজ্যের মানুষের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণবর্গের প্রবল বিরোধিতায় মহারাজ শেষ পর্যন্ত তাঁর সে সংকল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হন।[19]

রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ বেঁচে থাকলে কতদূর কী হত বলা যায় না। তিনি তো রইলেন না। 1913-এ মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। রাজপাট পেলেন মধ্যম মহারাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণ। দীক্ষিত ব্রাহ্ম তিনি, কুচবিহার নববিধান-মন্দিরেই তাঁর দীক্ষা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্রী গায়কোয়াড়-দুহিতা ইন্দিরা সনাতনী হিন্দু। এইবারে সুনীতি দেবীর আসন টলে গেল, যেন-বা বনবাসই বিধান। অবশ্য রাজারাজড়ার ঘরের কায়দাই তো ওই। রাজ্যেশ্বর স্বামীর মৃত্যু হলে ছেলের রাজত্বে ভূতপূর্ব মহারানী হন রাজমাতা,ত ঁারক র্তৃত্বক্ষ ু গ্নহ য় ।ব. ।জমাতারওম র্যাদাথ ।কে,কি স্তুত ।ভি ন্নজ ।তের। অবিবাহিত মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে সুনীতি দেবী পূর্ব-মহিমায় আসীন ছিলেন। তিনি লিখেছেন, জননীময় ছিল পুত্র 'রাজি'র জগৎ :

I was never relegated to the position of Dowager, but kept up the same status as I had done during his father's lifetime.[20]

মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ বিবাহিত ছিলেন। ফলে রাজারাজড়ার সংসারে যেমন হওয়া স্বাভাবিক, তেমনই হয়েছিল। মহারানীই সর্বেসর্বা এবং রাজমাতা সুনীতি যেন কিছু আড়ালে। কিন্তু তার চাইতেও বেশি কিছু ছিল কি, প্রথানুগ স্বাভাবিক বন্দোবস্তের চাইতে কিছু বেশি—সে কি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মেয়ে সুনীতি দেবীর সম্বন্ধে একুশ

তোপের সম্মানী বরোদার মহারাজার গরবিনী কন্যা, পুত্রবধূ মহারানী ইন্দিরার অশ্রদ্ধা ও অসহিষ্ণুতা যা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই রাজমাতা সুনীতিকে উদ্বাস্তু করেছিল? সংস্কৃতির ভিন্নতা তো ছিলই, কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা ও গায়কোয়াড়-দুহিতার সংস্কৃতি পৃথক হবারই কথা। ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্যও কি কোথাও কাজ করেছিল? ভারতের ও খাস বিলিতি অভিজাত সমাজে জনপ্রিয় মহারানী ইন্দিরা তাঁর বিলিতিরকম চালচলন সত্ত্বেও বিশ্বাসী হিন্দু ছিলেন আর প্রথমাবধি সেটা জাহির করার ঝোঁকও ছিল। প্রত্নপ্রমাণ কিছু নেই, এক গল্প আছে। সে গল্পকে অবিশ্বাস করার কারণও দেখছি না। কুমুদেন্দুর অভিজ্ঞতার কথাই সেটা।

হল কী, বড়ছেলের মৃত্যু আর মেজছেলের রাজ্যপ্রাপ্তির পর কুচবিহারে এসে নবীনা মহারানী পুত্রবধূ ইন্দিরাকে 'আর্যনারীসমাজে'র 'ভগিনী'দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য রাজমাতা সুনীতি তাঁর পার্লারে সভা করেছিলেন একদিন। তখনও তিনি কুচবিহার রাজপ্রাসাদে। তখনও নীলকুঠির অট্টালিকায় অর্থাৎ রাজমাতা নিবাসে উঠে যাননি। সুকুমারী মহারানী এলেন, অতি সম্ভ্রমপূর্ণ তাঁর চলন। কিন্তু এলেন হাতে এক সুদৃশ্য গণেশমূর্তি নিয়ে। সভাস্থলের কেন্দ্রে সেটিকে স্থাপন করে সুনীতি দেবীর 'ভগিনী'দের অভিবাদন করলেন তিনি। এ ঘটনা ইতিহাসের কোনো দলিলে লেখা থাকবে বলে মনে তো হচ্ছে না। মহারানীর আচরণের ব্যাখ্যাই-বা কী? সে কি নিরাকারবাদের প্রতি এক সনাতনী হিন্দু রমণীর অবজ্ঞার বিজ্ঞাপন? সে কি এই ইঙ্গিত যে, ব্রাহ্মরাজ্য কুচবিহারে ব্রাহ্মধর্মের দিন অবসান হল?

প্রমাণ কিছু নেই। প্রমাণ তো এটুকুই যে জিতেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের সূচনা থেকেই সুনীতি দেবীর বাকি জীবন কাটল কলকাতায় 'কমল-কুটিরে' পিত্রালয়ে, হোটেলে হোটেলে, ভাড়াবাড়িতে, ভারতের নানা স্থানে, ইংল্যান্ডে। মাঝে মাঝে, অন্তত 1925–26 পর্যন্ত কুচবিহারে আসা আর যাওয়া। সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় সুনীতিদেবীর 1913-এর পরের জীবন সম্বন্ধে কিছু সংবাদ আছে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে তিনি 'পিতৃধর্ম' নববিধানের পুনরুজ্জীবনে ব্যস্ত : 'নতুন করে ভিক্টোরিয়া কলেজ, 'আর্যনারীসমাজ', 'আনন্দ-বাজার' ইত্যাদির সংগঠনে মন দিয়েছেন। নববিধানের উৎসবগুলি পালিত হচ্ছে। গিরিডি ও করাচিতে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলন হচ্ছে। 'নূতন নূতন গান ও পুস্তক' লেখা হচ্ছে।[21] না-বলা কথাটা এই যে, সুনীতি দেবীর কর্মপরিকল্পনায় কুচবিহার স্থান পাচ্ছে না।

কীভাবে কী ঘটেছিল তা বলা যায় না। তবে কিছু তো ছিলই। প্রাক্তন মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের স্বল্পকালীন মেয়াদে কি রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজা ব্রাহ্মধর্মের প্রসারের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়েছিল? মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের শুরুতেই কি বাঁধ দেওয়ার একটা চেষ্টা হয়েছিল হিন্দু মহারানীর পৃষ্ঠপোষকতায়? যথেষ্ট প্রমাণ নেই তবে গভীর ইঙ্গিত আছে।

মহারানী ইন্দিরার কিছু গহনা চুরি গিয়েছিল। এই চুরির দায়ে প্রধান অভিযুক্ত হলেন নববিধান সমাজের সম্পাদক কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের বড়ছেলে। সাবিত্রী দেবী লিখেছেন :

> জামাল নামে রাজার একজন চাপরাসী সেই গহনা চুরি করে এবং ধরা পড়িবার ভয়ে একটা ইঁদারায় ফেলিয়া দেয়। পরে সে তাহা স্বীকার করে। এক ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ একখানা বেনামী চিঠি রাজাকে লেখে যে, ''আমি আপনার গহনা ইঁদারায় ফেলিয়া দিয়াছি।''[22]

এ ঘটনার বিশদ বিবরণ জানা যায় না। সাবিত্রী দেবীর পৌত্র কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ মনে করেন 1915–16 সময়কালের স্টেটসম্যান পত্রিকা এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। অন্যান্য সংবাদপত্রেও বিবরণ থেকে থাকতে পারে।[23] সাবিত্রী দেবী স্পষ্টই লিখেছেন, ''কতকগুলো ধর্ম্মবিরোধী কর্ম্মচারী'র এই ষড়যন্ত্র।'' কেন? না, ''রাজ্যে ব্রাহ্মধর্মের যাহাতে প্রচার না হয় ও আমার ছেলেদের উন্নতি না হয়।''[24] কিন্তু অন্যত্র তাঁর ইঙ্গিত, এই ষড়যন্ত্রের মূল নিহিত ছিল রাজপরিবারে। সে কথা পরে বলছি।

চুরিরম ামলাচ লেম াসতিনেক। 1916 সালের 1 মে থেকে াঅ কাতরেঅ র্থব্যয় করেন গজেন্দ্রনারায়ণ। একজন-দুজন নয়, কলকাতা থেকে আট আটজন ব্যারিস্ট্যার তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন। যাঁদের অন্যতম ছিলেন 'বিখ্যাত মহাত্মা C. R. Das'।[25] কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণের তখন জন্মও হয়নি। সবই তাঁর শোনা কথা। তিনি শুনেছিলেন, ব্রিফ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ কারণ, তাঁর মতে এ মোকদ্দমা মোকদ্দমার প্রহসনমাত্র। কুচবিহার দরবারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিচারব্যবস্থার একপেশেভাব, বিশেষত এভিডেন্স অ্যাক্টের দুরূপযোগ তাঁর মতো আইনবেত্তার পক্ষে অসহ্য হয়েছিল। অন্যদিকে, রাজপরিবারও মামলা তুলে নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।[26] সাবিত্রী দেবী লিখেছেন, বাদীপক্ষ বলেছিল :

> তোমাদের নির্দ্দোষী লিখে দেব, তোমরা case বন্ধ কর। এই কথা শুনিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম; কিন্তু ওরা নির্দ্দোষী লিখিল না মিথ্যা কথাই লিখিল।[27]

আসলে কী হয়েছিল, রফা হয়েছিল কীভাবে তা বলা যায় না। মামলা চলেনি, চুরি সপ্রমাণ হয়নি কিন্তু সপরিবারে নির্বাসিত হয়েছিলেন গজেন্দ্রনারায়ণ। তাঁর ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করেছিল দরবার। তাঁকে উদ্বাস্তু করেছিল। 'কতকগুলো ধর্ম্মবিরোধী কর্মচারী'র কথা বললেও স্থানান্তরে সাবিত্রী দেবী লিখেছেন কীভাবে 'রাজ্যের ও রাজার আদেশে' কুচবিহারের লোক বাধ্য হয়েছিল তাঁদের বয়কট করতে।[28] রাজার ইঙ্গিত না পেলে কি আর কর্মচারীরা তেমন ষড়যন্ত্র করার সাহস পেত? আর, 'রাজার আদেশ' কথাটা লেখার পর বলার কী বাকি থাকে? আরও তাৎপর্যপূর্ণ চিত্তরঞ্জন দাশের এই মন্তব্য—তিনি গজেন্দ্রনারায়ণকে বলেছিলেন, "Trust not the Princess"[29]। কে আর এই 'Princess' মহারানী ইন্দিরা ছাড়া?

(মহারানী তো আলঙ্কারিক উপাধি। ইংল্যান্ডেশ্বরই ভারতেশ্বর। ব্রিটিশ ভারতে বিস্তর রাজা-মহারাজা থাকলেও King তো ছিল না। Queenও না।)

এখন, এ তো ব্রাহ্মরাজ্য। মহারাজা স্বয়ং দীক্ষিত ব্রাহ্ম, যেমন তাঁর কনিষ্ঠরা। ব্রাহ্মধর্মের প্রসার রোধ করতে কর্মচারীরা যদি ষড়যন্ত্রই করে থাকে, তাতে মহারাজা মদত দেবেন কেন? শুধু স্ত্রীর খাতিরে? হয়তো আরও কিছু ছিল। জ্ঞাতিশত্রুতা যাকে বলে। সে ব্যাপারটাও যে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে এমন নয়। তবে সাবিত্রী দেবীর—"আমার ছেলেদের উন্নতি না হয়"—এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রাজার যেসব কর্মচারী ব্রাহ্মধর্মের বিরোধী (কার্যত সাবিত্রী দেবীর পুত্রদের উন্নতিরও বিরোধী) ছিলেন তাঁদের পরিচয় জানা যায় না। তাঁরা কি অন্যান্য 'রাজগণ' অর্থাৎ রাজবংশের নানা শাখার বংশধররা? একটি 'রাজগণ' পরিবারের, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের পরিবারের প্রতিষ্ঠায় কি তাঁরা ঈর্ষা বোধ করতেন? এই জ্ঞাতিশত্রুতার সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম-বিরোধিতা মিশে গিয়ে কি গয়নাচুরির অভিযোগ তোলা আর তারই সাহায্যে গজেন্দ্রনারায়ণকে বিতাড়িত করা? এসব প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না। তবে দেশিয় রাজ্যগুলিতে জ্ঞাতিশত্রুতা ও দরবারি দলাদলি, চক্রান্তের যেসব ঘটনা ঘটত তার তুলনায় অবশ্য এ সামান্য ব্যাপার।

সাবিত্রী দেবী লিখেছেন, রাজপরিবারের মধ্যে একমাত্র কনিষ্ঠ মহারাজকুমার হিতেন্দ্রনারায়ণ 'চিরদিনই আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মামলা চলাকালীন তিনি সত্যি সত্যি মারমূর্তি ধরেছিলেন, আর সেইজন্যই তাঁকে কুচবিহার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।'[30] 1916-এর অগাস্ট মাসে সাবিত্রী দেবী কুচবিহার ছাড়েন আর 1917-এর জুলাইতে হিতেন্দ্রনারায়ণ ভারি অসহায় আর করুণ এক চিঠি লিখেছিলেন সাবিত্রী দেবীকে। কিছু উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

> Listen Bino Aunty : both you and Mesho have had very severe blows–but believe me there is one nephew of yours, who will never let you suffer injustice in his lifetime and that is me. I am powerless but my heart goes out to you all. You must be brave and show the world whose daughter you are. I am proud to be a grandson of such a great man as 'Dadamoshyaya'.[31]

'দাদামশায়ে'র এই দৌহিত্র আর অল্পদিনই বেঁচেছিলেন। 1920-এ তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু বেঁচে থাকলেও কি আর কুচবিহারের শাসক জিতেন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো প্রতিকারের আশা ছিল? কনিষ্ঠ মহারাজকুমার তো সেই অর্থে অশক্তই ('powerless') ছিলেন। 1921-এ মৃত্যু হয়েছিল গজেন্দ্রনারায়ণের। কলকাতায়। কুচবিহার থেকে মুছেই গিয়েছিল কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় কন্যা ও জামাতার নাম।

কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল রাজমাতা সুনীতির? জানা যায় না। ঘটনাকালে তিনি কুচবিহারের বাইরে। ফিরছিলেন না, ফিরতে পারছিলেন না। তাঁর ফেরায় বহু বাধা

আসছিল। সেসব নিছক সমাপতন না-ও হতে পারে, মনে করেন কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ।[32] সুনীতি দেবীর আত্মজীবনীতে এ ঘটনার উল্লেখ নেই। ইংরেজি ধরনে বললে, দশজনের সামনে ময়লা কাপড় কাচা তো আভিজাত্য নয়, যদিও সেরকম কাচাকাচি, সত্যি কথা বলতে, ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হয়ে থেকে যেতে পারত। ব্রাহ্মধর্মের উচ্ছেদই হোক, আর যে উদ্দেশ্যেই হোক, ছোটবোনের স্বামী-পুত্রের এই লাঞ্ছনায় সুনীতি দেবী যত দুঃখই পেয়ে থাকুন (দুঃখ পাবেন, সেটাই স্বাভাবিক), তিনি তো মহারাজার মা। রাজমাতা হয়ে কি আর রাজার সমালোচনা আত্মজীবনীতে লিখতে পারতেন ?

অবশ্য এটা ভাবা ভুল হবে যে, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের, সাবিত্রী দেবীর নির্বাসনের ফলে কুচবিহারের নববিধান সমাজ বিলুপ্ত হয়ে গেল। তা হয়নি। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব হাতে এল তৃতীয় মহারাজকুমার 'ভিক্টর' নিত্যেন্দ্রনারায়ণের। তিনি হলেন নববিধান সমাজের নতুন সম্পাদক। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ধর্মপুত্র মহারাজকুমার ভিক্টর সুশিক্ষিত, বিদ্যোৎসাহী ও জ্ঞানোপাসক ছিলেন। তাঁর বাপ নৃপেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাসাগরের পুস্তক-সংগ্রহ খরিদ করেছিলেন। পুস্তক সংগ্রহ করা আর বই পড়ার ঝোঁক ছিল ভিক্টরেরও। রাজ্যের প্রাচীন পুঁথিপত্র ও প্রত্ন-অবশেষ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে তিনি ছিলেন অগ্রণী। রাজপ্রাসাদের অদূরে, সাগরদিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল তাঁর নিজস্ব আবাস, 'ভিক্টর প্যালেস' নামে খ্যাত (অন্য নাম 'সাগর মহল')। কুমুদেন্দুর পারিবারিক সূত্রের খবর : এই 'ভিক্টর প্যালেস' জায়গা নিয়েছিল 'সাবিত্রী লজ'-এর। 'আর্যনারীসমাজে'র অধিবেশন, 'আনন্দমেলা'—সবই তখন উঠে এসেছে ভিক্টরের বাড়িতে।

ভিক্টরের নেতৃত্বে কুচবিহার নববিধান সমাজের ইতিহাসে নবতর পর্ব সূচিত হতে পারত হয়তো। ঘরে ছিলেন ব্রাহ্মিকা স্ত্রী। দেখেশুনে ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের মেয়েকে ছেলের বউ করে এনেছিলেন সুনীতি দেবী। কিন্তু একটা ব্যাপার ছিল। কেশবচন্দ্র সেনের জামাতা কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ও কেশবচন্দ্র সেনের দৌহিত্র মহারাজকুমার ভিক্টর—দুজনেরজীবনেরঅ াদর্শ,দৃষ্টিভঙ্গি,জীবনযাত্রাছি ল পৃথক াস াবিত্রীে দবীর লেখাতে গজেন্দ্রনারায়ণের যে ছবি, সে ছবি এক অধ্যাত্মবাদী, নিবেদিতপ্রাণ ব্রাহ্ম প্রচারকের। নববিধান সমাজের প্রচার ও প্রসারই যাঁর জীবনের লক্ষ। অন্যদিকে, যদিও কেউ লেখেনি, ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণের ব্যাপারটা সেরকম নয়। কুচবিহারের নববিধান সমাজের নেতৃত্ব-গ্রহণ ব্যাপারে, বাপ-পিতেমোর সম্পত্তি ভাগজোক হয়ে, একেক জন যেমন একেকটা বিষয় পায়, তেমন কিছু হয়ে থাকতে পারে (যেমন মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ বাপের আদরের বোন নিঃসন্তান আনন্দময়ী দেবীর সম্পত্তি ভাই ভিক্টরকে লিখে দিয়েছিলেন)। কথাটা কিছু রূঢ় এবং এতে ভিক্টরের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকেও হয়তো খানিকটা অশ্রদ্ধা করা হচ্ছে। কিন্তু এরকম না বলেও তো উপায় নেই।

তাঁর বিবাহিত জীবনের কথাই ধরা যাক। সেটা কেশবচন্দ্রের পরিকল্পিত আদর্শ 'আর্য' নারী-পুরুষের দাম্পত্যের ধারেকাছেও যায় না। বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যেই স্বামীর ঘর ছেড়েছিলেন ভিক্টরের স্ত্রী নিরুপমা দেবী। তার কয়েক বছর পর আইনি ফারখত আদায় করেন তিনি। নিরুপমা দেবীর আত্মজীবনীতে কোনো ব্যক্তিগত বিবরণ নেই, শুধু 'দারুণ অপমান, লজ্জা, নিদারুণ শোকতাপের' প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের ইঙ্গিত আছে।[33] আসলে প্রকাশ্যে একপত্নীক এই রাজপুরুষের স্ত্রীলোকঘটিত দুর্বলতা ছিল প্রবাদতুল্য, তাঁর মদ্যপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। জনশ্রুতি এই যে, সেই সময়ের বাংলা থিয়েটারের কোনো 'নটী'কে নিয়ে (কে সেই অভিনেত্রী?) তাঁর মাতামাতি সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে যাই হোক, রাজারাজড়ার ঘরে সেরকম কেলেঙ্কারি কিছু অস্বাভাবিক নয়, অভিনবও নয়। এখন, রাজার মেয়ে হলে রাজপুত্তুর স্বামীর সেরকম নৈতিক শিথিলতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হত হয়তো। ব্রাহ্ম ব্যারিস্টারের মেয়ের পক্ষে অসম্ভব ছিল তা।

তাও ছোটখাট অনিয়ম মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণেরও ছিল। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী লিখেছেন, মহারাজা ছিলেন 'প্রসিদ্ধ নাচিয়ে'। আর, 'সুন্দরী মেমের (কালো সাদা দুই-ই) পিছনে' তাঁর ছুটোছুটির কারণে মহারানীকে 'বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছিল'। তবে, কী আর করা। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর এই মন্তব্যের মধ্যেই আছে সার কথাটা : ''রাজরানীর কপালই তো ওই।''[34] ব্রাহ্ম মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ পত্নীব্রত পুরুষের আদর্শ মেনে না চললেও মহারানী সুনীতি মানিয়ে নিয়েছিলেন তা তো বোঝাই যাচ্ছে। সেটা 'আর্যনারী'র পাতিব্রত্য হতে পারে, সেকালের স্ত্রীলোকোচিত সমাজ-সংস্কারের ভয় হতে পারে অথবা এক মহারানীর নিয়তি বলে মেনে নেওয়াও হতে পারে। নিরুপমা দেবীর কাছে সে সবকিছুই মূল্যহীন ছিল। বলা ভালো, মেয়েমানুষের মেয়েমানুষি ভাগ্যকে অস্বীকার করে 'সমস্ত রকম নিন্দা ও ধিক্কারের বিরুদ্ধে' অসম্মানের দাম্পত্য খারিজ করার সাহস ছিল তাঁর, যা সেই সময়ে (এই সময়েও বটে) খুব সহজ ছিল না।

এ ঘটনা কুচবিহারের ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। হিন্দু রক্ষণশীল ভদ্রসমাজএ কঅ স্ত্রে পেয়েছিলহ াতে।স্ত্রীলোকেরদ্ব ারাস্বামীত্যাগেরম তোভ য়ানক অশাস্ত্রীয় ব্যাপার 'ম্লেচ্ছ' ব্রাহ্মদের পক্ষেই ঘটানো সম্ভব, এই রটনা ছিল। অন্যদিকে, এটাও বলা দরকার, কুচবিহারের 'আর্যনারীসমাজে'র আধুনিকারা মনে করেছিলেন, 'রানী নিরুপমা ভারত-নারীর মুখ হাসালেন'। এ সবই লেখকের পারিবারিক শ্রুতি।

1922-এ মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হল। উত্তরাধিকারী জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ নাবালক। রাজ্য গেল মহারানী ইন্দিরা দেবীর হাতে। যথেষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি না, কিন্তু এরকম অনুমান যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে যে, এই সময়ে কুচবিহার রাজপরিবারে ব্রাহ্মধর্ম তার, এমনকী, আনুষ্ঠানিক মর্যাদাও হারাল। বিলেত থেকে আনা মহারাজার চিতাভস্ম কাশীর গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হল। মহারাজার শ্রাদ্ধকর্মের বিবরণ এরকম :

> 11ই ফেব্রুয়ারি হিন্দু-ক্ষত্রিয় মতে মৃত মহারাজার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ। প্রয়োজনীয় প্রায়শ্চিত্ত করার পর একদিন আগে মস্তকমুন্ডন সম্পন্ন করা হয়, এরপর পূরকপিন্ড, অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত, তিলকাঞ্চন ও অন্যান্য আচার-পদ্ধতি সেরে তারপর আদ্যশ্রাদ্ধ এবং তারও পর শালগ্রামশিলার সামনে যোড়শ রৌপ্য ও মহাদান। বৃষোৎসর্গ ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিয়ে মহাদানের মধ্যে হস্তীদান, অশ্বদান, পালকিদান ও নৌদান সম্পন্ন হল।[35]

শ্রাদ্ধকর্ম নিঃসন্দেহে রাজোচিত এবং হিন্দুজনোচিত হয়েছিল। জিতেন্দ্রনারায়ণের চিতাভস্ম তাঁর পিতা নৃপেন্দ্রনারায়ণ, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরের চিতাভস্মের মতো কুচবিহারের রাজকীয় সমাধিস্থলে রক্ষিত হয়নি। হিন্দু মহারানী ইন্দিরা দেবী যে নববিধানের মতে সমাধি নির্মাণের চাইতে মণিকর্ণিকার ঘাটে ভস্ম-বিসর্জনকে শ্রেয় মনে করেছিলেন তাতে আর সন্দেহ কী। অন্যদিকে মহারানী ইন্দিরার পুত্র জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ কাগজে-কলমে ব্রাহ্মই থেকে গিয়েছিলেন। অন্তত ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করেছিলেন এমন শোনা যায় না। 1970-এ তাঁর মৃতদেহের দাহ-সংস্কারের আগে কুচবিহার প্রাসাদে নববিধান সমাজের তৎকালীন আচার্য বিনীতকুমার মুখোপাধ্যায় যথাবিধি ব্রহ্মোপাসনা করেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাক্তন সহ-সম্পাদক অসীম আমেদ এ ঘটনার সাক্ষী।[36] জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ মহারাজার হিন্দুমতে শ্রাদ্ধাদি হয়েছিল কিনা জানা নেই। তাঁর চিতাভস্ম অবশ্যই রক্ষিত হয়েছিল কুচবিহারের কেশবাশ্রমে, পিতামহ ও পিতৃব্যদের সমাধিবেদীর পাশে। জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতুস্পুত্র (সম্ভবত দত্তক-পুত্রও বটে) ও উত্তরাধিকারী কুচবিহারের শেষ রাজা মহারাজাবি রাজেন্দ্রনারায়ণের(মৃত্যু 1992) সমাধিওএ খানেব. ক্ষিত।হ ন্দিরা। দবীর রিজেন্সি শাসনকালে প্রয়াত রাজমাতা সুনীতি দেবীর সমাধি কুচবিহারে নেই, যেমন নেই মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের সমাধি।

জিতেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর যে রিজেন্সি কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল তার অন্যতম সদস্য ছিলেন মহারাজকুমার ভিক্টর। 1926–27 নাগাদ তিনি সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। কুচবিহার ছেড়ে, ভারতবর্ষ ছেড়েও, ইংল্যান্ডে গিয়ে থিতু হন তিনি। কেন, কে জানে।ত ারম ূলেকি বি. জেন্টম হোদয়ারস ঙ্গেঅ বনিবনা ?অ থবাত াকি ব ্যক্তিগত জীবনের কোনো ঘটনার অভিঘাত? কুচবিহারের সঙ্গে তাঁর আর সম্পর্ক ছিল না। 1937-এ তাঁরও মৃত্যু ইংল্যান্ডেই। কোথায় আছে, আছে কি, কুচবিহার নববিধান সমাজের সম্পাদকের সমাধি?

ভিক্টর মহারাজকুমারের চলে যাওয়াতে কুচবিহারের ব্রাহ্মসমাজ নিঃসন্দেহে হীনবল হয়েছিল। একথা সত্য যে, ভিক্টরের চরিত্রে এমন অনেক কিছুই ছিল যা ব্রাহ্মসমাজের নেতা হিসাবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করার মতো। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজ ও কুচবিহার রাজবংশের মধ্যে প্রত্যক্ষ সেতুস্বরূপ। তাঁর অবর্তমানে ব্রাহ্মসমাজের ক্ষীণপ্রায় গুরুত্ব ক্ষীণতর হয়েছিল, অনুমান হয়।

ব্রাহ্মসমাজ রইল। আচার্য কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় রইলেন। রাজদরবার নববিধান সমাজের অর্থবরাদ্দ বাতিল করেনি। রাজতন্ত্রের অবসানের পরও নির্দিষ্ট অর্থের যোগান বন্ধ হয়নি। তার একটা প্রমাণ তো এই যে, 1970-এর দশক পর্যন্ত সমাজ-মন্দিরে আলো জ্বলত। সাপ্তাহিক উপাসনা হত। কলকাতা থেকে নববিধানিদের আসা-যাওয়া ছিল, বিশেষত মাঘোৎসবে। শুধু মন্দিরের দুষ্প্রাপ্য কালো কাঠের বেঞ্চগুলো খালি পড়ে থাকছিল। ব্রাহ্ম উপাসক-মণ্ডলী ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছিল। ক্বচিৎ-কদাচিৎ, সত্তরের দশকের কথা বলছি, স্থানীয় অ-ব্রাহ্ম, অদীক্ষিত কেউ কেউ উপাসনায় যোগ দিত। তাদের কারো কারো সঙ্গে সুনীতি দেবীর কালের যোগ ছিল। যেমন কুমুদেন্দু-কন্যা জ্যোতিরিন্দু ও তাঁর পুত্র অমিয়ভূষণ মজুমদার।

কালে কেদারনাথের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তাঁর পুত্র বিনীতকুমার। বিনীতকুমার মুখোপাধ্যায় জীবিত ছিলেন 2009 পর্যন্ত। দুর্ভাগ্যজনকই, যে, যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাছে গিয়ে বসা হয়নি। জেনে নেওয়া হয়নি কুচবিহার ব্রাহ্মসমাজের অলিখিত ইতিহাসের তথ্যগুলি। জানা হয়নি কী করে কী হল; কবে আর কেন সপরিবারে কুচবিহার ছেড়ে চলে এলেন তিনি, কবে থেকে নববিধান মন্দিরটি হয়ে উঠল দুর্বৃত্তদের নিরাপদ আশ্রয়, আর, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের ভগ্নস্তূপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এশিয়ার বৃহত্তম সমাজ-মন্দিরটি। ঐতিহ্য রক্ষার প্রেরণায় ইদানীং কুচবিহার পৌরসভা মন্দিরটিকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে। কিন্তু ধূপের ধোঁয়ার মতো, ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গীতধ্বনিও বহুকাল আগেকার বাতাসে মিলিয়ে গেছে। বাতাসের তো স্মৃতিও থাকে না।

কোথায় গেলেন কুচবিহারের আণুবীক্ষণিক ব্রাহ্মগোষ্ঠী? কলেজের, স্কুলের অধ্যাপক-শিক্ষক, রাজকীয় আমলা, কর্মচারীদের বংশধররা? তোর্ষা নদীর পারে পাটাকুড়ার ব্রাহ্মপল্লীর (নববিধান থেকে 'বিধানপল্লী' নাম ছিল তার) গৃহস্থরা? চাকরির মেয়াদ ফুরোলে চলে যাওয়াই স্বাভাবিক হয়তো ছিল বাংলাদেশের নানা অঞ্চলের এবং কলকাতার সেসব ব্রাহ্ম ভদ্রলোকদের। কিন্তু একটি পরিবারও স্থায়ী হল না! কুচবিহারবাসীর সাধারণ ব্রাহ্মবিরোধী মনোভাবের সঙ্গে কি তার যোগসূত্র আছে? 1922-এর পর থেকে দরবারের নিয়োগ-নীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে। নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমল থেকে যেভাবে যোগ্য এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্মঘেঁষা মানুষদেরই নানা পদে নিয়োগ করা হত, তা হয়তো আর হত না। ফলে স্বতঃই রাজ্যে ব্রাহ্মদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল।

দরবারি নীতির কথায় এক চমৎকারী পুস্তিকার কথা মনে এল। সেটা আরও আগের কথা। জিতেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের প্রথম দিকের। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল **'নৃপেন্দ্রস্মৃতি'** নামের এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা (1915)। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু প্রতিপন্ন করার চেষ্টা আছে এই বইয়ে। মহারাজার ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাস ইত্যাদির উল্লেখও নেই। বাল্যকালে মহারাজা নিয়মিত আহ্নিক

করতেন, দেবদেবীর 'প্রস্তর ও ধাতুমূর্তি' পুজো করতেন, ব্রাহ্মণ ও সাধু-সন্দর্শনে আনন্দ পেতেন, পরেও 'সম্পূর্ণ দেশীয় স্বধর্ম্মভাবে স্নান-পূজা ও আহারাদি সম্পন্ন করতেন'—এসব খবর দিয়েছেন লেখক দীনদয়াল চৌধুরী। কিন্তু বিশেষ প্রণিধানযোগ্য পুস্তিকার এই বিবরণ :

> এই লেখক একদিন রাজাকে বলিলেন, ''মহারাজ, যে সকল ব্যক্তি বাহ্যত ধর্ম্মভাবে বিভোর, তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ নিগূঢ় ব্যাপার আপনি কিছু বুঝিতে পারেন কিনা।'' রাজা বলিলেন, ''আমি যেদিন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া আমার পৈতৃক ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিব সেইদিন তুমি কে কেমন লোক নিজ চক্ষে দেখিবে, আমি কাহারও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি না।''
>
> যথাকালে মহারাজা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া অবসর গ্রহণ করিবেন, হরেন্দ্রনারায়ণের জপমালা করে লইবেন ইহাও বলিলেন।[37]

খুবই তাৎপর্যময়। ব্রাহ্ম হয়ে বুঝি পইতে ফেলেছিলেন ক্ষত্রিয় নৃপেন্দ্রনারায়ণ, তাই 'যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া' স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত। আর, শুধু যে 'পৈতৃক ধর্ম্মপথ গ্রহণ করিবেন', তাই নয়। প্রপিতামহ হরেন্দ্রনারায়ণের জপের মালাও হাতে করবেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ধর্মগতপ্রাণ শক্তি-উপাসক হিন্দু ছিলেন। শেষজীবনে পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণকে রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে কাশীবাসী হয়েছিলেন। সেদিক থেকে, লেখকের বিবরণ-মতে, নৃপেন্দ্রনারায়ণ প্রপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তনের আর বাকি রইল কী? মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের সূচনা থেকে হিন্দুভাব পুনরুজ্জীবনের যে প্রয়াস চলেছিল বলে অনুমান করছি, তার সঙ্গে এই পুস্তিকার ভাব চমৎকার মানিয়ে যায়। স্টেট প্রেস থেকে বইটি ছাপা নয় বটে, তবে এর এক সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল '**পরিচারিকা'য়**।[38] নববিধান সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'পরিচারিকা' তখন প্রকাশিত হচ্ছে নবপর্যায়ে, কুচবিহার থেকে। বলা বাহুল্য হবে, কুচবিহার রাজ্যের টাকায়।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনের এই সংকল্প কবেকার, তা লেখক বলেননি। 1911-এ একরকম আকস্মিক মৃত্যুই হয়েছিল মহারাজার। সংকল্প যদি তাঁর থেকেও থাকে তা কাজে লাগানোর সময় তিনি পাননি। অন্যদিকে ইতিহাসকারের কলমে মহারাজার শেষ ইচ্ছাগুলি নথিভুক্ত আছে। ডেভিড কফ লিখেছেন, নৃপেন্দ্রনারায়ণের শেষ ইচ্ছা ছিল এইরকম : নববিধান ধর্মমতে যেন তাঁর শেষকৃত্য হয়, তাঁর চিতাভস্ম যেন সমাধিস্থ হয় কুচবিহার রাজপ্রাসাদের আঙিনায়, চিতাভস্মের উপরে কেশবচন্দ্রের সমাধিবেদীর অনুরূপ বেদী যেন স্থাপিত হয়।[39] ঠিক সেরকমই হয়েছিল। জীবদ্দশায় যেমন, মৃত্যুতেও মহারাজা নববিধানকে অস্বীকার করেননি। উল্লঙ্ঘনও না। সেকথা তাঁর বংশধরদের ক্ষেত্রেও সত্য। ব্রাহ্ম আদর্শ অনুসারে ওঠাবসা না করলেও ব্রাহ্মধর্মকে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকারও করেননি।

কুচবিহারের ব্রাহ্ম-অতীত সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাতে ছবিটা স্পষ্ট হয় না। ব্রাহ্মিকা সুনীতি দেবীর জীবন সম্বন্ধেও একই কথা। তিনি আত্মজীবনী লিখেছিলেন (কুচবিহারের ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে সে বইয়ে কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না, আগে বলেছি)। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল 1921-এ। তারপরও প্রায় একযুগ তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু তখন, বললে ভুল হবে না, কুচবিহার রাজ্য থেকে তিনি নির্বাসিত। তা কি স্বেচ্ছা-নির্বাসন? স্বামী-সন্তানদের অকালমৃত্যু কি তাঁকে উন্মনা করেছিল? কিংবা কুচবিহারব. াজপরিবারেরক াছেতি নিঅ প্রয়োজনীয়,অ পাংক্তেয়?প্রমাণে নই,কি ন্তু অনুমান হয়, স্বামী ও সন্তানদের অকালমৃত্যুতে রিক্ত জীবন রিক্ততর হয়েছিল গৃহহীনতায়। 1926 পর্যন্ত কুচবিহারে তাঁর আসা-যাওয়া ছিল, এরকম সংবাদ আছে কুমুদেন্দু দেবীর পারিবারিক শ্রুতিতে। 1925-এ লেখা চিঠিতে তো প্রমাণ আছেই, তিনি তখনও আসছেন। কুমুদেন্দুর দৌহিত্র অমিয়ভূষণ মজুমদার (জন্ম 1918) 'খুব ছোটবেলায়' সুনীতি দেবীকে, তাঁর ব্রাহ্মসমাজ ও 'আনন্দমেলা' দেখেছিলেন। তারপর, আগে যেমন বলেছি, ব্রাহ্মসমাজ অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, এইমাত্র।

1928-এ ইংল্যান্ডে চলে যান সুনীতি দেবী। দুখিনী জননীর শেষ অবলম্বন তৃতীয় পুত্র ভিক্টর তখন ইংল্যান্ডে প্রবাসী। ছেলের সযত্ন সাহচর্য বোধহয় কিছুদিন পেয়েছিলেন সুনীতি দেবী, রাজমাতা। 'ভক্তকবি' মধুসূদন রাও-এর দৌহিত্রী, হেমলতা সরকারের পুত্রবধূ সুনীতি দেবী ইংল্যান্ডে বেড়াতে গিয়ে দেখেছিলেন মাতাপুত্রের ঘরকন্না। ছেলে ভিক্টর, মহারাজার কুমার, নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতেন মাকে। বলতেন, ''বেশি ঝাল হয়নি। তুই খেতে পারবি।''[40]

তবু সে পরবাস। সে নির্বাসন। কুচবিহার থেকে কতদূরে সেই বিষণ্ণ জীবনসন্ধ্যায় লেখা হয়ে থাকছিল শ্রান্ত দিবসান্তের লিপিগুলি। 'অতীতের সুখময় দৃশ্যের' স্মৃতি, সব হারানোর হাহাকার, ঘরে ফেরার আকুলতা তার অক্ষরে অক্ষরে।

1931-এ ভারতে ফেরেন সুনীতি দেবী। কুচবিহারে নয়। ঠিক একবছর পর ভগ্নস্বাস্থ্য, নিঃসঙ্গ মহারানীর মৃত্যু হয়েছিল সেকালের স্বাস্থ্যনিবাস বলে পরিচিত রাঁচি শহরে। কলকাতায় নয়, কুচবিহারে নয়। স্বগৃহে নয়। রেল কম্পানির হোটেলে।[41]

কেমনভাবে কেটেছিল তাঁর সেই বিষাদের প্রহরগুলি আমরা জানি না। উনিশ শতকের নারীজীবনে যাঁদের আগ্রহ তাঁরাও সুনীতি দেবী সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। একটি সূত্রে সেসময়ের কিছু উল্লেখ দেখছি। সুনীতির বাল্যসখী, সহপাঠিনী' সাধ্বী'ক মলা দেবীরক নিষ্ঠ পুত্রচ লচ্চিত্রকার,অ ভিনেতাম ধুব সু সেই শেষের দিনগুলির বিষন্নতাকে এভাবে এঁকেছেন :

> ... রাঁচির বি.এন.আর হোটেলে এসে উঠেছিলেন কুচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবী—ইন্দিরা মহারানীর শাশুড়ি। ... বিরাট প্রাচুর্য ও জাঁকজমকের মধ্যে তাঁর জীবনের বহুদিন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এখন আর তাঁর সেই আগেকার সুখের

দিন ছিল না। স্বামী গেছে; চার ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে মাত্র এক ছেলে ও এক মেয়ে বেঁচে ছিল—তাও তারা দুজনেই তখন বিলেতে। রাঁচিতে ছিলেন শুধু তাঁর এক ভাই—নির্মলচন্দ্র সেন এবং তাঁর পরিবার। তাঁরা অন্য হোটেলে থাকতেন।

মধু বসু লিখেছেন, সুনীতি দেবী গাড়ি পাঠাতেন কমলা দেবীকে নিয়ে আসার জন্য, তাঁর হোটেলে—'সম্ভবত নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্য।'[42]

তারপরে একদিন, কুচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবী, অধুনা রাজমাতা, নিঃশব্দে চোখ বুজলেন কখন যেন। শেষ সময়ের কোনো বৃত্তান্তই কি আছে? কুচবিহারে যখন এসে পৌঁছুল এ খবর, শোকপালন করেছিল কুচবিহারবাসী?

★ ★ ★ ★

মহারানীর নামাঙ্কিত একটি সরকারি বালিকা বিদ্যালয় আছে সে শহরে। 'সুনীতি একাডেমী'ন ামেরম ধ্যেথ াকেনব_াক্ষিকাস ুনীতি াঅ ারহ য়তো,য দিএ খনও৫ তমন রীতি থেকে থাকে, সুনীতি একাডেমীর দিনারম্ভের *পিতা নোহ্‌সি* স্তবে আর ব্রহ্মসঙ্গীতের সুরে কুচবিহারের ব্রাহ্ম-অতীত জেগে থাকে।

1. The Cooch-Behar State and its Land-Revenue System, Babu Harendra Narayan Chowdhury, Cooch-Behar State Press, 1903, p.437.
2. The Brahmo Samaj and the shaping of the Modern Indian Mind, David Kapf, Princeton, 1979, p.328.
3. History of the Brahmo Samaj, Sivanath Sastri, Calcutta, 1911. গ্রন্থের সর্বশেষ মুদ্রণের (1993)535 পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠার বছর 1873, 541 পৃষ্ঠায় 1875। এ কি মুদ্রণ প্রমাদ? উল্লেখনীয় যে সারা ভারতের আঞ্চলিক/প্রাদেশিক সমাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিলেও কুচবিহারের ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে শাস্ত্রীমশায় কিছু লেখেননি। এমন কি হতে পারে, রাজকীয় আনুকূল্য সত্ত্বেও কুচবিহার রাজ্যে ধর্মপ্রচার নিস্ফল হয়েছিল বলেই কিছু লেখার মতো ছিল না?

   দেওয়ানসাহেব রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সম্বন্ধে এটি শোনা কথা। অন্য একটি সূত্রে দেখছি কুচবিহারে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় 1866 সালে, অর্থাৎ কুচবিহার বিবাহের বারো বছর আগে (প্রাচীন কোচবিহারের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, স্বপনকুমার রায়, কলকাতা, 1413 বঙ্গাব্দ, পৃ.215) গ্রন্থকার তাঁর দেওয়া তথ্যের উৎস নির্দেশ করেননি। শাস্ত্রীমশায়ের গ্রন্থে প্রদত্ত সময়টি (1873/1875) সেক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে।
4. মূল রচনাটি দেখিনি। মহারানী সুচারু দেবীর জীবনকাহিনী, প্রভাত বসু, কলকাতা, 1369 বঙ্গাব্দ, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ.27-28.

5. Kopf, প্রাগুক্ত, পৃ.328-29 দ্রষ্টব্য।
6. এবি যয়েঅ াগেলি খেছি: Rethinking Cooch-Behar's Vaishnava Past, North East Indian History Congress, XXVIII Session (Goalpara), 2007.
7. স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, সাবিত্রী দেবী, কলকাতা, 1928, 159 পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। চিঠিটির অব্যবহিত পূর্বের চিঠি 1901-এ লেখা, অব্যবহিত পরেরটি 1907-এ।
8. নরেশচন্দ্র জানা- মানু জানা সম্পাদিত 'আত্মকথা' গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, কলকাতা, 1981, পৃ.37
9. সাহিত্যসাধক চরিতমালা, নবম খণ্ড, কলকাতা, 1359 বঙ্গাব্দ গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত জীবনী, পৃ.11
10. একথা শুনেছি কুচবিহারের ঐতিহ্যাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তান হিমাদ্রিশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের মুখে। স্বপনকুমার রায় লিখেছেন (প্রাগুক্ত, পৃ.229-30) 1890 সালে মদনমোহন মন্দির (যা মদনমোহনবাড়ি নামে প্রসিদ্ধ) প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কুচবিহারে এসে 'হিন্দুধর্মের উৎকর্ষতা বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন'।
11. সাবিত্রী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ.96
12. Autobiography of an Indian Princess, Sunity Devi, London, 1921. বিশ্বনাথ দাস সম্পাদিত নবীন সংস্করণে (New Delhi, 1995) Life at Cooch-Behar শীর্ষক অধ্যায় (পৃ.90-100) দ্রষ্টব্য।
13. সাবিত্রী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ. 33-34 দ্রষ্টব্য।
14. তদেব, পৃ. 25-31.
15. Sunity Devi (New Ed.), p.181.
16. কোচবিহারের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), খানচৌধুরী আমানতুল্লা আহমেদ, কুচবিহার স্টেট প্রেস, 1936। নবীন সংস্করণের (কলকাতা, 1990), পৃ.289
17. Sunity Devi, p.181। কী সে উৎসব? 'মদনকামের পূজা' কি? এরকম মনে পড়ছে, আমার শৈশবকালে (1960–70-এর দশকে) আমার পিতামহীর সংসারে নিষিদ্ধ যা যা ছিল তার মধ্যে একটি ছিল এই পূজা সম্বন্ধে আলোচনা। বোধহয় সাগরদিঘির পাড়ে অথবা জলে কিছু হত, বিশেষ সমারোহই হয়তো-বা। আলোচনা যখন নিষিদ্ধ, দেখার প্রশ্নও ওঠে না।
18. সাবিত্রী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ.94

19. হিমাদ্রিশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে আলাপচারী
20. Sunity Devi, op.cit, p.182
21. প্রভাত বসুর পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃ. 28-29) উদ্ধৃত।
22. সাবিত্রী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ. 108
23. কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
24. সাবিত্রী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ.108
25. তদেব, পৃ.109
26. কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সাবিত্রী দেবী লিখেছেন, চিত্তরঞ্জন দাশের মন্তব্য এই ছিল যে : *''আমি জীবনে অনেক মোকদ্দমা করিয়াছি, কিন্তু এরূপ আগাগোড়া মিথ্যা মোকদ্দমা কখনও জীবনে দেখি নাই।''* (পৃ. 110)। সাবিত্রীদেবীর বই পড়ার আগেই, কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগেও, গয়নাচুরির মামলা যে নেহাত সাজানো ব্যাপার তা কিন্তু জানতাম। বোধহয়, শুধু আমাদের পরিবারই নয়, কুচবিহারের প্রত্যেকটি লোকই সেরকম জানত।
27. সাবিত্রী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ.109
28. তদেব, পৃ.113
29. তদেব, পৃ.111
30. তদেব
31. তদেব, পৃ.184 দ্রষ্টব্য
32. কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার
33. 'আমার জীবন। সাহিত্য সাধনার স্মৃতি'—এই শিরোনামে নিরুপমা দেবীর আত্মকথা এক্ষণ পত্রিকায় (শারদীয় সংখ্যা 1401 বঙ্গাব্দ) পাওয়া যাবে। একটি প্রাসঙ্গিক সংযোজন : অনেক লেখায় নিরুপমা দেবীকে 'কুচবিহারের রানী', এমনকী, 'কুচবিহারের মহারানী' বলে উল্লেখ করা হয়। নিরুপমা দেবীর কুচবিহার-বিবাহসূত্রে লব্ধ উপাধি 'ঈশ্বরানী', সংক্ষেপে 'রানী'। 'কুচবিহারের রানী' কিংবা 'মহারানী' কথাটা ঠিক নয়।
34. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর 'জীবনকথা' (দ্বিতীয় পর্ব), এক্ষণ শারদীয় সংখ্যা 1400 বঙ্গাব্দ।
35. স্বপনকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.296
36. অসীম আমেদের সঙ্গে আলাপচারী

37. ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত 'নৃপেন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থের (কলকাতা, 2007) পৃষ্ঠা 46–68 দ্রষ্টব্য। এই উদ্ধৃতি 68 পৃষ্ঠা থেকে।

38. পরিচারিকা নবপর্যায় 1:8, আষাঢ় 1322 বঙ্গাব্দ, তথ্যটির জন্য ড. নৃপেন্দ্রনাথ পালের কাছে ঋণী।

39. Kopf, op.cit., p.329। সুনীতি দেবীর আত্মকথায় এর উল্লেখ নেই। গোল্ডারস গ্রিন সমাধিক্ষেত্রে ব্রাহ্মমতে দাহ-সংস্কারের কথা আছে (পৃ.76)। মহারাজার ইচ্ছাঅ নুসারেব. াজপ্রাসাদের(গালাপ-বাগিচায়তঁারচি তাভস্মস মাধিস্থহ য় (পৃ.190 দ্রষ্টব্য)। মহারাজার দুই ছেলে, মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ও মহারাজকুমার হিতেন্দ্রনারায়ণের চিতাভস্ম একইভাবে মহারাজার সমাধির পাশে রক্ষিত হয়েছিল। স্বপনকুমার রায় লিখেছেন (পৃ.302) 1924 সালে এই সমাধিগুলি প্রাসাদ-অঙ্গন থেকে সরিয়ে কেশবাশ্রমে স্থাপন করা হয়। তখন মহারানী ইন্দিরা দেবীর রিজেন্সি শাসনের কাল। কেশবাশ্রম প্রকৃতপক্ষে ধর্মবিষয়ক আলোচনা ও ধর্মসাধনার স্থল হিসাবে পরিকল্পিত হয়েছিল। সুনীতি দেবীর দুটি চিঠিতে 'আশ্রম পূর্ণ করিয়া বসা'র কথা আছে। আমার পিতৃদেব অমিয়ভূষণ মজুমদারের শৈশবস্মৃতিতেও কেশবাশ্রমের ধর্মসভার উল্লেখ বহুবার শুনেছি। মহারানী সুনীতির সমাধি আছে 'কমল-কুটিরে', যেন তা তাপিত জীবন শেষে বাপের নিশ্চিন্ত নির্ভরতার কোলে সুখনিদ্রা। সেরকম সাবিত্রী দেবীরও।

40. 'স্মৃতিকথা', 'সুনীতি দেবী', ঐতিহাসিক 10:1–2, বৈশাখ-চৈত্র 1408 বঙ্গাব্দ।

মহারানী সুনীতির আত্মকথার নবীন সংস্করণের ভূমিকা (পৃ.9–10) দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গান্তরে, মহারাজকুমার ভিক্টরের জননীকে 'তুই' সম্বোধনের কথায় বলি, ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছায় এবং নির্দেশে, মহারানীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কুচবিহারের রাজকুমারদের বিলেতে পাঠানো হয়েছিল। সুনীতিদেবী এই ব্যবস্থার সমালোচনা করে লিখেছেন : "They returned home knowing Greek and French, but they did not know Sanskrit or Urdu and found it difficult to speak freely and fluently in the Cooch-Behar language." (p.149). 'Cooch-Behar Language' তো বাংলাই, 'নিজদেশ-ভাষা', অজ্ঞ লোকে যদি-বা তাকে 'বাহে ভাষা' বলে। মহারাজকুমার ভিক্টর কি 'নিজদেশ-ভাষা'র রীতিতেই 'মাও'—মা-জননীকে 'তুই' বলতেন? একসময়ে বোধহয় সব বাঙালিই মাকে 'তুই' বলত, বিদ্যাসাগরমশায় বলতেন এমন প্রমাণ আছে। কিন্তু সে তো অনেক আগেকার দিনে। 'নিজদেশে' আজ পর্যন্ত তা বলা হয়। কুচবিহারের ভাষা সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন : *উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে*, অমিয়ভূষণ মজুমদার, রচনাসমগ্র অষ্টম খণ্ড, কলকাতা, 2010

41. সুনীতি দেবীর আত্মজীবনীর ভূমিকা (পৃ. 9–10) দ্রষ্টব্য।
42. আমার জীবন, মধু বসু, নবীন সংস্করণের (কলকাতা, 2012) পৃ.154। সম্ভবত তিনকন্যার মধ্যে দুজন জীবিত ছিলেন। মধ্যম মহারাজকুমারী প্রতিভা দেবীর (ম্যান্ডার) মৃত্যু হয়েছিল 1923-এ।

প্রবন্ধটির শেষ অংশ ও কিছু প্রাসঙ্গিক চিঠি পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

এণাক্ষী মজুমদার

হারিকেন স্যান্ডি এবং পারমাণবিক বিজ্ঞান

সমর বাগচী

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী—বারাক ওবামা এবং মিট রমনির মধ্যে যে বিতর্ক চলছিল কয়েকমাস ধরে সেই সময় হারিকেন স্যান্ডি আমেরিকার পূর্বপ্রান্তকে আঘাত করে। তাঁদের বিতর্কে তাঁরা জলবায়ুর পরিবর্তন সম্বন্ধে নিশ্চুপ ছিলেন। এ নিয়ে আমেরিকার কাগজের সম্পাদকীয়তে অবিরত মন্তব্য আসে। স্যান্ডি চলে যাওয়ার পরেও এ নিয়ে মন্তব্য চালু থাকে আমেরিকার মিডিয়াতে। 1988 সালের নির্বাচনের পর এই প্রথম 2012-এর নির্বাচনে জলবায়ু নিয়ে কোন বিতর্ক উত্থাপিত হয়নি।

আবহাওয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে নিশ্চুপতা নির্বাচন বিতর্কে বজায় ছিল ঠিক সেইরকম নিশ্চুপতা ছিল মিডিয়ায় কোন বিতর্ক ওবামা ও রমনির পারমাণবিক শক্তির অবিচল সমর্থনে। মিডিয়ার পক্ষে এটি একটি অমার্জনীয় নিশ্চুপতা। কারণ এই বিরাট ঝঞ্ঝা এবং 2012 সালের অন্যান্য বিভিন্ন চরম জলবায়ু সমস্যা পারমাণবিক কেন্দ্রগুলির ওপর বিরাট বিপদের সম্ভাবনা উপস্থিত করছে।

বারোটারও বেশি পারমাণবিক কেন্দ্র আছে স্যান্ডির গতিপথে। ঐ কেন্দ্রগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটিই হচ্ছে ফুকুসিমার কেন্দ্রগুলির GE Mark1-এর মতো ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইনে নির্মিত। বন্যার জল (ফুকুসিমার মতো) যখন Oyster Creek এবং New Jersey-র পারমাণবিক কেন্দ্রের 6টি পাম্পের মধ্যে 4টিকে প্লাবিত করে তখন শীততাপ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। ফলে নিস্তেজ (spent) জ্বালানি রডগুলি শীতল করার ব্যবস্থা অকেজো হয়ে যায় যেমন হয়েছিল ফুকুসিমায়। তেজস্ক্রিয় বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। হারিকেনের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় আরো তিনটি চুল্লি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ঐসব চুল্লিগুলি পুরোনো হয়ে যাওয়ায় চুল্লিগুলির ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

ওবামা এবং রমনি উভয়েই জলবায়ু পরিবর্তন সম্বন্ধে তাঁদের বিতর্কে নিশ্চুপ থেকে পরমাণু শক্তিকে 'Clean' বলে ছাড়পত্র দেন এবং উমেদারি করেন।

2011 সালের ফুকুসিমা বিপর্যয়ের পর সারা বিশ্বেই পারমাণবিক শক্তির আগ্রহে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেয়। 2012 সালের World Nuclear Industry Status Report বেরিয়েছে। সেই রিপোর্ট সুস্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে সারা বিশ্বের আর্থিক মন্দা,

ফুকুসিমা বিপর্যয়, নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, পারমাণবিক শক্তির খরচ, ঋণ শোধের ক্ষমতা (credit rating) এবং শেয়ারের মূল্যের অবনয়নের ফলে পারমাণবিক শক্তির চাহিদা কিভাবে কমে যাচ্ছে সারা বিশ্বে। 2011 সালে 19টি চুল্লি বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাত্র 7টি নূতন চুল্লি নির্মিত হয়। 5টি শিল্পোন্নত দেশ স্থির করে যে তারা তাদের পারমাণবিক চুল্লিগুলিকে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেবে। দেশগুলি হল : জার্মানি, বেলজিয়াম, সুইৎসারল্যান্ড, তাইওয়ান এবং জাপান। অন্তত 5টি দেশ, যেমন ঈজিপ্ট, ইতালি, জর্ডান, কুয়াইত এবং থাইল্যান্ড, যারা পারমাণবিক চুল্লি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারাও পরিকল্পনা স্থগিত করেছে বা ভাবনাচিন্তা করছে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াও নূতন পরমাণু চুল্লি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেছে। চিন এবং অন্য কয়েকটি দেশও নতুন চুল্লি স্থাপন করার সিদ্ধান্তকে সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে ভাবনাচিন্তা করছে।

আমেরিকার হারিকেন স্যান্ডির বিপর্যয় একটি জলবায়ু বিপর্যয় যা ফুকুসিমার পারমাণবিক বিপর্যয়ের অনুরূপ। এবছরের পরপর কয়েকটি রেকর্ড ভাঙা আবহাওয়া ঘটনার পর স্যান্ডি আমেরিকার পূর্বপ্রান্তে আছড়ে পড়ে। যা আবহাওয়া বিজ্ঞানী ইনসিওরেন্স এবং ব্যবসা বিশেষজ্ঞরা বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়ঙ্কর আভাস; জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ পারমাণবিক চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটাবে।

পারমাণবিক শক্তির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল 1950 এবং 1960-এর দশকে সেই সময়কার জলবায়ুর অবস্থা এবং তার বিপদের আশঙ্কাকে মাথায় রেখে, আজকের যে ভয়ঙ্কর জলবায়ু পরিবর্তন এসেছে তাকে মাথায় রেখে নয়। বর্তমান জলবায়ুর গভীর সংকট যে পাঁচটি সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে সমস্যা সৃষ্টি করছে পরমাণু শক্তির ক্ষেত্রে :

1. পারমাণবিক কেন্দ্রের বিরাট জলের চাহিদা যা জীবাশ্ম জ্বালানি কেন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি। এর ফলে জলের চাহিদার ক্ষেত্রে খরার সময় কৃষির জলের চাহিদার সঙ্গে এর প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

2. প্রচণ্ড তাপমাত্রা এবং খরার ফলে উৎপাদন হ্রাস এবং কেন্দ্রের বন্ধ হয়ে যাওয়া। এর ফলে পরমাণু কেন্দ্র থেকে নির্গত জলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এই সবের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে ঘাটতি পরে তা মেটাতে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা বাড়ে।

3. বন্যারজ ন্যে কন্দ্রেরব ন্ধহ য়েয াওয়াএ বংে সইজ ন্যজীবাশ্মজ্বালানিব যবহার করে বিদ্যুতের প্রয়োজন মেটানো।

4. যে অত্যধিক গরম জল কেন্দ্র থেকে সমুদ্রে বা জলাশয়ে ছাড়া হয় তার ফলে জলজ জীবজগতের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব। এবং

5. খরাজনিত যে দাবানল সৃষ্টি হয় তার ফলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া।

প্রচুর জল খরচ

পরমাণু শক্তি এমন এক প্রযুক্তি যা, যেখানে প্রচুর জল আছে সেখানেই করা চলে, তাই নদী বা সমুদ্রের উপকূলেই কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয়। কারণ, পরমাণু কেন্দ্রকে ঠাণ্ডা রাখতে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়। জীবাশ্ম জ্বালানি কেন্দ্র যখন বন্ধ থাকে তখন কোন জলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পরমাণু কেন্দ্র বন্ধ থাকলেও জল সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হয়। নাহলে core meltdown হয়ে যায়। তাছাড়া প্রচুর নিস্তেজ (spent) তেজস্ক্রিয় জ্বালানি রড, যা বাইরে থাকে, তাকে waterpool-এ ঠাণ্ডা রাখার জন্যও প্রচুর জল লাগে। পৃথিবীর 60 শতাংশ পরমাণু কেন্দ্রেই জলের প্রয়োজন বিশাল। চুল্লিকে বা নিস্তেজ রডগুলিকে ঠাণ্ডা করার পর ঐ গরম জল ছাড়া হয় বড় জলাশয়ে 20° থেকে 30° ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। একটি 1000 মেগাওয়াটের পারমাণবিক চুল্লিকে ঠাণ্ডা রাখতে ঘণ্টায় 3 থেকে 4 কোটি গ্যালন জলের প্রয়োজন হয়। যা 40 থেকে 50 লক্ষ মানুষ বাড়িতে এক ঘণ্টায় ব্যবহার করে। এই যে বিরাট পরিমাণ জল যখন সমুদ্র, হ্রদ বা নদী থেকে টানা হয় তখন জলের সঙ্গে অনেক ময়লা, সমুদ্র-শৈবাল এবং জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণী উঠে আসে যা ফিলটার স্ক্রীনকে রুদ্ধ করে এবং চুল্লিকে অকেজো করে দেয়। এছাড়া প্রতিটি ধাপে প্রচুর পরিমাণে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়। একটি পরমাণু কেন্দ্র বছরে লক্ষ লক্ষ পরিণত মাছ এবং কোটি কোটি মাছের ডিম ও লার্ভাকে ধ্বংস করে। যে গরম জল জলে পড়ে তা জলের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে। এই সমস্ত ক্ষতিকর প্রভাবের যদি খরচ হিসেব করা হয় তাহলে মৎস্য ও আমোদপ্রমোদ শিল্পে কোটি কোটি ডলার ক্ষতি হয়।

2003 সালে আমেরিকার কালিফোর্নিয়ার San Onofiye পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে যে জল সমুদ্র থেকে টানা হয় তাতে প্রায় 35 লক্ষ মাছ মারা যায়। লং আইল্যান্ডের সাউন্ডকীপারের (Soundkeeper) গণনা অনুসারে মিলস্টোন পরমাণু কেন্দ্রের জন্য 15,000 কোটিরও বেশি মাছের লার্ভা এবং বড় মাছ গত তিন দশকে মারা গেছে। 1976 থেকে 2003 সালের মধ্যে মিলস্টোন কেন্দ্র প্রায় 400 কোটি শীতকালের ফ্লাউন্ডার মাছের মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

আমেরিকার এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সির (EPA) নিয়ম অনুসারে পরমাণু কেন্দ্র বা জীবাশ্ম জ্বালানি কেন্দ্রে যে closed loop জলশীতক ব্যবস্থা চালু করার কথা তা করা হয়নি। এই ব্যবস্থায় মুক্ত loop ব্যবস্থার চেয়ে অনেক কম জলের প্রয়োজন হয় এবং অনেক কম জলজ জীব ধ্বংস হয়। খরচ বাঁচাবার জন্য এইসব কেন্দ্র closed loop system চালু করতে চায় না। যদি জলের অভাব হয় বা জলের তাপমাত্রা বেড়ে যায় তাহলে এইসব জলনির্ভর শক্তিকেন্দ্রের কি দশা হবে? এ ব্যাপারে 2012 সালের রেকর্ড ভাঙা গ্রীষ্ম চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

খরা ও উষ্ণতা

2012 সালের 9 অগাস্ট US Drought Monitor যে তথ্য দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকা মহাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ সীমিত বা বিরল খরায় ভুগেছে। এক-চতুর্থাংশ দারুণ খরায় পড়েছে। যে সমস্ত জায়গায় পরমাণু কেন্দ্র আছে সেখানেই বেশি করে খরা এসেছে। যেমন, আমেরিকার মধ্যপশ্চিম, দক্ষিণপূর্ব এবং নিউ ইংল্যান্ডের কিছু অংশ। এর ফলে জলের অভাবে এবং উচ্চ তাপমাত্রার জন্য ঐসব অঞ্চলে অবস্থিত পরমাণু কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন কমিয়ে দিতে হয়। বহু কেন্দ্রকে জলে বেশি গরম ঢালার জন্য বিশেষ ছাড়পত্র নিতে হয়। একটি কেন্দ্রকে বন্ধও করে দিতে হয়। কনেকটিকাটের ওয়াটারফোর্ডের মিলস্টোন কেন্দ্রকে 2012 সালের অগাস্টের মধ্যভাগে দুটি চুল্লির একটিকে বন্ধ করে দিতে হয়। কারণ, সমুদ্রের জল খুব গরম। ফলে কেন্দ্রকে ঠাণ্ডা রাখা মুশকিল হয়। যখন কেন্দ্রের নকশা তৈরি হয় তখন এইরকম অবস্থার কথা ভাবা হয়নি। ঐ কেন্দ্রের 37 বছরের চলার ইতিহাসে Long Island Sound-এর সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা এত বেশি হয় যে পরমাণু কেন্দ্রে ব্যবহার করা যায় না। কনেকটিকাট নদীতে জলের প্রবাহ খরার জন্য কমে যাওয়ায় Vermont Yankee পরমাণু কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন বারবার ব্যাহত হয়। জুলাই মাসে ঐ নদীর জল সাধারণের চেয়ে 50 শতাংশ কমে যায়।

2003 সালের গ্রীষ্মের খরায় পরমাণু কেন্দ্র এক বিরাট সমস্যায় পড়ে। 500 বছর এইরকম গরম পড়েনি। ইউরোপের অর্দ্ধেক খরায় পড়ে এবং প্রায় 10,000 মানুষ গরমে মারা যায় যারা বিশেষ করে বৃদ্ধ। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যায়। ফ্রান্সের 17টি পরমাণু কেন্দ্রের উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া হয় বা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়াও বহু শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, কমপিউটার ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়, শস্যহানি হয় এবং বিকল্প শক্তি যোগান দিতে বিরাট খরচ হয়।

তাপ দূষণ

আমেরিকাতে যে তাপ দূষণ সৃষ্টি হয় তার তিন-চতুর্থাংশ আসে শক্তিকেন্দ্রগুলি থেকে। তাপ দূষণের ফলে জলে অক্সিজেন কমে যায়। তার ফলে মাছের এবং অন্যান্য জলজ জীবের বিপাকীয় ক্রিয়া (metabolism) বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ঐসব জলজ জীব অনেক তাড়াতাড়ি খাদ্যগ্রহণ করে এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে। তাপ দূষণের জন্য জলজ জীবের জননক্রিয়ায় সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং বিরাটভাবে ব্যাকটিরিয়া, শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ এবং অন্যান্য উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে। 2012 সালের 22 জুলাই শীতক জলের অত্যাধিক গরম হয়ে যাওয়ার জন্য 4টি পরমাণু এবং 4টি কয়লা জ্বালানি কেন্দ্রকে বার বার ছাড় দেওয়া হয় নদী এবং হ্রদে অত্যধিক গরম জল ছাড়ার জন্য, যাতে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রেখে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বজায় রাখা যায়। ঐ

রাজ্যের নিয়ম অনুসারে সর্বোচ্চ 90° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় গরম শীতক জল জলে ছাড়া যায়। কিন্তু জরুরি অবস্থায় 100° তাপমাত্রায় জল ছাড়ার অনুমোদন দেওয়া হয়। রিভার নেটওয়ার্কের নদী, শক্তি এবং জলবায়ুর ডিরেক্টর Wendy Wilson বলছেন যে, "We have terrible thermal pollution problems in this country, and the result is dead and dying rivers. Nobody's managing the system. We're all just praying for rain" অথচ, এই অধিক বৃষ্টির জলবায়ু পরিবর্তিত বিশ্বে পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে বিপদ সৃষ্টি করে।

বন্যা

নেব্রাস্কার কোর্ট ক্যালহাউন (Fort Calhoun) পরমাণু কেন্দ্র এপ্রিল 2011 থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় মিসৌরি (Missouri) নদীর জলে আংশিক প্লাবিত হওয়া, দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হওয়া এবং বন্যার বিরুদ্ধে পরিকল্পনাহীনতার জন্য। ঐ কেন্দ্রের নীচে মাটির ধারণ ক্ষমতার নিশ্চয়তা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ জানা নেই। এর জন্য এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বন্যার সময় জল যে দূষিত মাটি জল নীচের দিকে বয়ে নিয়ে যায় সে সম্বন্ধেও কোন পরীক্ষা হয়নি। ঐ শক্তিকেন্দ্র দুটি বাঁধের নীচে অবস্থিত। যদি বাঁধে কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে ঐ কেন্দ্রে বিপর্যয় আসবে।

উজানমুখী বাঁধে বিপর্যয়জনিত বিপদ

রিচার্ড পারকিনস হচ্ছেন নিউক্লিয়ার রেগুলেটারি কমিশনের (NRC) একজন ইঞ্জিনিয়ার কর্তা। উনি দেখিয়েছেন যে উজানমুখী বাঁধে যদি কোন বিপর্যয় আসে তাহলে পরমাণু কেন্দ্রে core meltdown সৃষ্টি করবে। একথা NRC চেপে গেছে। উনি ছিলেন জুলাই 2011-এর NRC রিপোর্টের প্রধান হোতা। ঐ রিপোর্ট আসে ফুকুসিমা দুর্ঘটনার 4 মাস পর। ঐ রিপোর্টে বাঁধে দুর্ঘটনার এবং পরমাণু কেন্দ্রে বন্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থার বিপদ সম্বন্ধে বলা হয়। ঐ রিপোর্ট বলে যে পরমাণু কেন্দ্রের উজান বাঁধে, যদি কোন বিপর্যয় আসে তাহলে কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে এবং চুল্লিতে meltdown হতে পারে। আমেরিকার প্রায় 30টি চুল্লি বড় বড় বাঁধের নিচে অবস্থিত। সাউথ ক্যারোলিনার ওকোনি (Oconee) কেন্দ্র সম্বন্ধে আরেকজন রিস্ক ইঞ্জিনিয়ার বলেন, "The probability of Jocassee Dam catastrophically failing is hundred of times greater than (the chance of) a 51 foot wall of water hitting Fukushima Dai – Ichij।" এটানি শিচত যব াঁধেয দিবি পর্যয়অ াসেত াহলেও কোনিরতি নটি চুল্লিতে core meltdown হবে; NRC-র ইনস্পেক্টর জেনারেলের অফিসকে জোরের সঙ্গে জানায় যে NRC ইচ্ছে করে তার রিপোর্টের কথা চেপে যায়, যাতে জনসাধারণ জানতে না পারে তার রিপোর্টে কেন্দ্র পরিচালকদের বন্যা নিরোধক ব্যবস্থার ব্যর্থতার কথা বলা ছিল।

দাবানল

1910 সালের অগাস্ট মাসে রেকর্ড ভাঙ্গা খরা এবং তাপদাহের ফলে দাবানল পশ্চিম রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে দূষণ মস্কো এবং অন্যান্য শহরের বাতাসকে গ্রাস করে। রাশিয়ার এমারজেন্সি মন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা সতর্কক রে‌ে দয়‌ে যদ াবানলজনিতঝ ড়‌ে চর্নোবিল‌ে থকে‌ে তজস্ক্রিয়ক ণাশ তশ ত যোজন দূরে অবস্থিত রাশিয়া এবং তার বাইরের শহরে ছড়িয়ে পড়বে। চের্নোবিলের core meltdown-এর জন্য স্ট্রনশিয়াম 90 এবং সিজিয়াম 137 ছড়িয়ে পড়ে যার অর্ধ জীবন হচ্ছে 30 বছর। ঐসব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পুরোপুরি ক্ষয় হতে সময় লাগে প্রায় 300 বছর। তাই ঘনায়মান খরা এবং দাবানল তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ায় বিপদকে বাড়িয়ে দেয়।

2011 সালের গ্রীষ্মে নিউ মেক্সিকোর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দাবানল সৃষ্টি হয় যা লস এলামস ল্যাবোরেটারির পারমাণবিক অস্ত্র গবেষণা কেন্দ্র এবং তার বর্জ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার সংলগ্ন প্রায় 50,000 একর অঞ্চলকে জ্বালিয়ে দেয়। সেই সময় সেখানে কাপড়ের টেন্টের নীচে প্রায় 30,000টি পঞ্চান্ন-গ্যালনের ড্রামে প্লুটোনিয়ম দূষিত বর্জ্য জমা ছিল যা অপেক্ষা করছিল নিউ মেক্সিকোর তেজস্ক্রিয় পদার্থর আস্তাকুড়ে স্থানান্তরিত করার জন্য। জলবায়ু পরিবর্তন যে পরমাণু শক্তির পক্ষে বিপদজ্জনক সে সম্বন্ধে পরমাণু শিল্প কি বলছে তা একটু শোনা যাক।

শিল্প এবং ওয়াল স্ট্রিটের প্রত্যাখ্যান

জন্ম-সময় থেকে পরমাণু শিল্পকে সরকার বহুভাবে সাহায্য করেছে। সাধারণ মানুষের কাছেও জন্ম সময় থেকে তা খুবই জনপ্রিয় ছিল। তবুও আজ পরমাণু শিল্প মৃতপ্রায়। আমেরিকার পরমাণু শিল্প ব্যবসায়ী ও আর্থিক বাজার আজ পরমাণু শিল্প থেকে সরে আসছে। আমেরিকার সবচেয়ে বড় পরমাণু বিদ্যুৎ নির্মাতা শিল্পসংস্থা হচ্ছে Exelon। তারা 22টি পরমাণু কেন্দ্রের মালিক। ঐ প্রতিষ্ঠানের CEO 2012 সালের মার্চ মাসে বলেন যে, পরমাণু শক্তি আর্থিক দিক থেকে যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি বলেন, “I have never met a nuclear plant I didn’t like ... but it just isn’t economic within a foreseeable timeframe।” 2013 সালের বসন্তকালে Dominion Resources ঘোষণা করে যে তারা উইমনসিনে তাদের Kewaunee পরমাণু কেন্দ্র বন্ধ করে দেবে। কোন‌ে ক্রতান া‌ে পয়েঐ ‌ে কাম্পানিস্বীকারক রে‌ে যঅ র্থনীতিইএ কমাত্রক ারণঐ কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেবার। ফুকুসিমার দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন পরমাণু কেন্দ্রের নিরাপত্তা এবং পুরানো চুল্লির মেরামতের খরচ এত বেড়ে গেছে যে পরমাণু বিশেষজ্ঞরা বলছেন এর ফলে একটা domino effect হবে। অর্থাৎ, একটার পর একটা পরমাণু কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে। ওয়াল স্ট্রিট আর পরমাণু শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করবে না।

অচল ভুবিদ্যা

Nuclear Regulatory Commission (NRC)-এর নূতন চেয়ারম্যান Dr. Allison Macfarlane, যিনি NRC-র প্রথম ভূতত্ত্ববিদ, মনে করেন যে পরমাণু শিল্পে ভূমিকম্পের বিপদের ঝুঁকির বিশ্লেষণ অচল এবং অনুপযুক্ত। একটি পরমাণু কেন্দ্র যখন স্থাপন করা হয় তখন ইতিহাসে সবচেয়ে বড় যে ভূমিকম্প যা ঘটেছে তাকে মনে রেখে পরিকল্পনা করা হয়। তিনি বলেন, "That will not do, knowledge of geology has advanced since the US power plants were built, and continues to do so; new earthquake risk studies and new safety measures for new nuclear power plants are critical।" Dr. Macfarlane তাঁর সহযোগীদের অনুসন্ধান করতে বলেন, "broad array of natural events that could affect nuclear power operations in future." যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন। Union of Concerned Scientists-এর প্রহরী বিজ্ঞানী David Lochbaum, NRC যে নিরাপত্তাহীন পরমাণু চুল্লি চালানোর অনুমতি দেয় তার সম্বন্ধে সম্প্রতি অভিমত প্রকাশ করেন যে, "47 reactors that the NRC knows to violate fire protection regulations and with 27 reactors with seismic protection known to be less than the seismic hazards they face. These pre-existing vulnerabilities mean that the American public is protected more by luck than by skill."

কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ এবং পরমাণু কেন্দ্র

শূন্য কার্বন নির্গমনের আচ্ছাদনে পরমাণু শক্তি একটি ধূর্ত নেকড়ে বাঘ। একটি পারমাণবিক কেন্দ্রের জীবনচক্রে সে যত CO_2 ছাড়ে তা একটি প্রাকৃতিক গ্যাস প্ল্যান্ট যা ছাড়ে তার প্রায় এক চতুর্থাংশ। একটি পরমাণু কেন্দ্রের জন্ম থেকে অকেজো করে দেওয়া অর্থাৎ খনি থেকে ইউরেনিয়াম তোলা, অকেজো জ্বালানি রডকে সংরক্ষণ করে ঠাণ্ডা রাখা, এবং সেই রড থেকে প্লুটোনিয়াম উদ্ধার কার্যক্রম পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে খুবই বেশি করে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে। নূতন পরমাণু কেন্দ্র এতই খরচ সাপেক্ষ এবং একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে এত সময় লাগে যে ভাবতে ইচ্ছে করে যে সস্তায় এবং শীঘ্র নির্মাণ করা সম্ভব এমন একটি বিকল্প শক্তি কেন্দ্র করা যায় কিনা যা 20 থেকে 40 গুণ কম কার্বন ছাড়বে। এই বিকল্প ব্যবস্থাগুলি কি হতে পারে? :

1. দক্ষতা, 2. নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস, 3. কারখানা এবং গৃহের জন্য বিদ্যুৎ ও তাপের cogeneration। পারমাণবিক শক্তি বর্জন করলে নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়বে। ইউরোপের যেসব দেশ বেশি বেশি করে সৌর ও বায়ুশক্তি ব্যবহারে এগিয়ে যাচ্ছে তারা পরমাণু কেন্দ্র ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেমন জার্মানি। অথবা, কোন পরমাণু কেন্দ্র স্থাপন করবে না এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেমন, ডেনমার্ক ও পর্তুগাল। বিকল্প নিরাপদ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র এখন পর্যন্ত কোথাও সাফল্যলাভ করেনি।

বর্জ্য এবং পারমাণবিক অস্ত্র

দুটি সমস্যা যা পরমাণু শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা ভয়ঙ্কর। তারা হল পরমাণু শক্তির প্রতিটি পর্যায়ে বর্জ্যের সমস্যা, যার এখন পর্যন্ত কোন দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হয়নি। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার। তেজস্ক্রিয়তা হচ্ছে আজ পারমাণবিক শক্তির সবচেয়ে বড় সমস্যা। এখনই যা দেখা যাচ্ছে ফুকুসিমা দাইচি কেন্দ্রের সুনামির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অকেজো জ্বালানি রডে যদি ওখানে আরেকটা বড় ভূমিকম্প হয় তাহলে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হবে। আজ আমেরিকার পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে যে পরিমাণ বর্জ্য জমা হয়েছে তা পরিকল্পিত পরিমাণের চেয়ে চারগুণ। এই বর্জ্যের তেজস্ক্রিয়তার সমস্যা চুল্লির চেয়েও বেশি। জলে বেশি বেশি সঞ্চিত করা জ্বালানি রডের গরম হয়ে আগুন লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে। পরমাণু পলিসি বিশেষজ্ঞ Robert Alvarez-এর মতে আমেরিকার কোন পরমাণু কেন্দ্রের জলের pool-এ রক্ষিত অকেজো রডে যদি আগুন লাগে তাহলে চের্নোবিলের চেয়ে 60 গুণ বড় জায়গা লোকবসতির অনুপযুক্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া এই অকেজো জ্বালানি হচ্ছে সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। এ সত্ত্বেও আমেরিকার Air Authority পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের 1000 ফিটের মধ্যে উড়োজাহাজ ওড়বার অনুমতি দেয়।

যে কোনো দেশ যারা পরমাণু কেন্দ্র স্থাপন করেছে তারাই পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে পারে। কারণ ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম যা পরমাণু চুল্লিতে তৈরি হয় এবং অকেজো জ্বালানি রডে থাকে তার থেকে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম বোমা তৈরি করা যেতে পারে। এরই জন্য ইরানের বা উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আমেরিকার স্নায়ুযুদ্ধ। সেই 1946 সালে আমেরিকার Federal রিপোর্ট বলছে "the development of atomic energy for peaceful purposes and the development of atomic energy for bombs are in much of their course inter-changeable and interdependent।" এইজন্য পারমাণবিক বোমা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য সমস্ত পারমাণবিক বস্তুর ওপর একটি শক্ত বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ জরুরি। এখন এইরকম কোন কর্তৃত্ব নেই। যা আছে তা হল কয়েকটি পরমাণু শক্তিধর দেশের কর্তৃত্ব। তারা হচ্ছে 'haves' এবং অন্যরা 'have nots'। তারাই স্থির করে কে পারমাণবিক ক্লাবে যোগ দিতে পারবে আর কারা পারবে না। তাই "peaceful nuclear technology" একটা ভাঁওতা। এই স্লোগান 1950-এর দশকে বিশ্বের বহু মানুষকে এবং দেশকে প্রভাবিত করেছিল। যদি একটি বিশ্ব বা স্থানিক পরমাণু যুদ্ধ ঘটে তাহলে "Nuclear Winter" নেমে আসবে পৃথিবীতে। তার ফলে অভাবনীয় এবং বিপর্যয়কর জলবায়ু পরিবর্তন হবে, বহু বছর সূর্যালোক কমে যাবে, যার কুপ্রভাব পড়বে কৃষির ওপর।

শক্তির দক্ষতা এবং ভবিষ্যৎ নবীকরণযুক্ত শক্তি

নবীকরণ শক্তির প্রয়োগের ব্যাপারে আজ নেতৃত্ব দিচ্ছে ডেনমার্ক এবং জার্মানি। এই দুই দেশ হিসেব করেছে কারা পৃথিবীর তেল ও গ্যাসের মালিক এবং ফুকুসিমার দুর্ঘটনার পর জাপান কি সমস্যায় ভুগছে। ঐ উভয় দেশই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা জীবাশ্ম জ্বালানি এবং পরমাণু মুক্ত হবে। আমেরিকার কর্তারা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যে নিস্তব্ধতা গড়ে তুলেছে তা সুপার স্যান্ডির প্রবল দূর্যোগের পর শুরু হয়নি। হোয়াইট হাউস 2009 সাল থেকে এই অবস্থা বজায় রেখেছে। পরিবেশবাদীদের মতে ঐ কারণেই আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট তাঁদের ডেকেছিলেন। তাঁদের বোঝান হচ্ছিল যে জলবায়ুর পরিবর্তনকে অর্থনৈতিক সুবিধা হিসেবে দেখতে। তাঁদের বলা হল "a chance of job creations and economic growth, rather than a crucial environmental problem।" মিডিয়াও প্রেসিডেন্টের সুর গাইতে লাগল। 2009 থেকে 2011 সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সম্বন্ধে কাগজে প্রবন্ধ 41 শতাংশ কমে গেল। জলবায়ু পরিবর্তন সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামতের পরিবর্তন এল। তৈল ব্যারন Koch ভ্রাতারা, পরমাণু এবং জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানি এবং তাদের ব্যবসায়ী সংশোধনগুলো নানাভাবে প্রচারের মধ্যে দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনে কার্বন নিঃস্বরণের প্রভাব নস্যাৎ করবার জন্য তাদের তাঁবেদার বিজ্ঞানীদের কাজে লাগাতে শুরু করল। এই কাজে যোগ দেয় American Legislative Executive Council। এই সময়ে US Department of Energy (DoE)-এর অধীনে National Renewable Energy Laboratory 2012 সালের জুলাই মাসে নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসের সম্ভাবনা নিয়ে একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট পেশ করে। ঐ রিপোর্ট সম্বন্ধে DoE মন্তব্য করে, "The major finding of the Renewable electricity Futures Study supports a nuclear-free, zero carbon renewable energy future।" ঐ রিপোর্ট অনুসারে, 2050 সালে সমস্ত আমেরিকাতে প্রতি ঘণ্টায় যা বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে তার 80 শতাংশ যোগান দিতে পারবে আজ নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের যে প্রযুক্তি জানা আছে তা প্রয়োগ করে। আমেরিকার গত প্রেসিডেনশিয়াল বিদেশনীতি বিতর্কে এইসব প্রশ্ন আসেনি যদিও মধ্যপ্রাচ্যে তেল নিয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি উপস্থিত হয়েছে। কেন ওবামা প্রশাসন এবং মিডিয়া আমেরিকায় সৌর ও বায়ুশক্তি উৎপাদনের যে নাটকীয় বৃদ্ধি ঘটেছে 2008 থেকে 2012 সালের মধ্যে সে সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট জনসাধারণকে জানাচ্ছে না? এই বৃদ্ধি 60টি পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের উৎপাদনের সমান। গত 4 বছরে বায়ুশক্তির উৎপাদন দ্বিগুণের বেশি এবং সৌরশক্তি 4 গুণ বেড়ে গেছে যা জীবাশ্ম জ্বালানি বৃদ্ধির চেয়ে বেশি। অন্যদিকে পরমাণু শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। পরমাণু এবং জীবাশ্ম জ্বালানি শক্তির কর্পোরেট মালিকরা শুধুই ভিন্নমতকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে না, চুপিসারে নবীকরণযোগ্য শক্তির বিস্তারে বিরোধ সৃষ্টি করছে। Solyndra নামে এক সৌরবিদ্যুৎ

কোম্পানিকে 52.9 কোটি ডলার ধারের গ্যারান্টি দিয়েছিল সরকার। সেই কোম্পানীর যখন ভরাডুবি হয় তখন কংগ্রেসে এবং মিডিয়াতে মতলব করে উত্তেজনা ছড়িয়ে সৌরশক্তির যে অভাবনীয় বৃদ্ধি ঘটেছে তাকে চেপে যাওয়া হয়। ঐ হল্লা সৌরশিল্প যে রেকর্ড করা নূতন কাজ সৃষ্টি, দামের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সরকারের যে Loan Guarantee Programme তার সাফল্য চেপে দিল। আমেরিকার মিডিয়াতে সৌরশক্তির যে সাফল্য তা সবচেয়ে কম খবরে এসেছে। এই সমস্ত বিকল্প শক্তি উৎপাদনে যে নূতন কাজ সৃষ্টির সম্ভাবনা তাকে চেপে গিয়ে ভোটে জিতে ওবামা বলেন, "If the message is that we are going to ignore jobs and growth simply to adiven climate change, I don't think anyone's going to go for that, I won't go for that।" অশিক্ষিত মিডিয়া প্রেসিডেন্টের এই জলবায়ুর পরিবর্তন এবং কাজ সৃষ্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি এবং নবীকরণযোগ্য শক্তি সম্বন্ধে যে নীরবতা তার বিরুদ্ধে কোন লেখা প্রকাশ করেনি। একটু তথ্য ঘাঁটলেই আমরা বুঝতে পারব যে নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রয়োগই জলবায়ু পরিবর্তনকে রুখতে পারবে। অর্থনীতি বৃদ্ধি আনবে এবং নূতন নূতন কাজ সৃষ্টি করতে পারবে।

অসমাধানযোগ্য সমস্যার পরিবর্তে আমাদের সামনে এক অপূর্ব সুযোগ দাঁড়িয়ে আছে। গত এক শতাব্দী ধরে শিল্পোন্নত দেশগুলো দক্ষতা এবং নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসকে ভিত্তি করে এক স্থায়ী শক্তি - অর্থনীতি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। যে শক্তির পথএ ইসবে দশনি য়েছেত ারইফ লেঘ টছে চর্নোবিল, Exxon Valdez, Katrina, Deepwater Horizon, ফুকুসিমা, স্যান্ডি, তেল নিয়ে যুদ্ধ এবং জলবায়ু পরিবর্তন। নাগরিক সমাজের দাবির ফলে জার্মানি তার ৪টি পুরোনো পরমাণু চুল্লিকে বন্ধ করে দিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে 2022 সালের মধ্যে সমস্ত চুল্লি বন্ধ করে দেবে। এই ঘোষণা সম্ভব হয়েছে গত এক দশকের নবীকরণযোগ্য শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য। গবেষকদের মতানুসারে শক্তি ব্যবহারের এই পরিবর্তন অর্থনীতির ওপর খুব কমই প্রভাব ফেলবে। এই যে পরিবর্তন তা পরমাণু ও জীবাশ্ম জ্বালানী শক্তি এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণের মধ্যে এক স্বতঃসিদ্ধ যোগ আছে এই ভাবনাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের যে দায়িত্ব আছে, 2012 সালে জলবায়ুতে যে ভয়ানক ঘটনা ঘটেছে এইসব কথা ভেবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সৌর, বায়ু এবং জলের অফুরন্ত শক্তির প্রয়োগে।

তথ্য সূত্র : Internet-এ প্রাপ্ত H. Patricia Hynes লিখিত প্রবন্ধ "Climate Silence, Nuclear Silence and Solar Silence : An Unholy Tririty

বিবেকানন্দের উৎস সন্ধানে

আলোক চট্টোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় নানান বিষয়ে উৎসাহী অনেক মানুষের কাছে নিতান্ত অনুপস্থিত। পরিচিতি যেখানে বা আছে সেই পরিচিতিও নিতান্ত অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো। একদল বিবেকানন্দের সম্বন্ধে অনাগ্রহী তাঁর সন্ন্যাসীর পোষাকের জন্যই। এই দলের একটা অংশ যাঁরা বিবেকানন্দের লেখালেখির অংশবিশেষ কোথাও কিছু পড়ে ফেলেছেন তাঁরা বিবেকানন্দকে সন্ন্যাসী বলে মানতেই নারাজ। এসব হল, ইন্টেলেকচুয়াল চিন্তাভাবনা। সেখানে আগ্রহ নেই, বিশ্লেষণ আছে। বিবেকানন্দ যে সমাজ সংস্কারক নন, গোঁড়া সাধু নন, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী নন সে কথা বুঝতে বেশি দেরি হওয়ার কথা নয়। এক কথায় বিবেকানন্দকে যেহেতু কোন সামাজিক অভিধায় চিহ্নিত করা কঠিন, তাই অনায়াসেই শিথিল আলস্যে কিছুটা নেড়েচেড়ে তাঁকে ত্যাগ করা যায় অনায়াসে।

অন্যদিকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নির্বিশেষে, সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধি ছাড়াও হেমচন্দ্র ঘোষ, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ক্ষেত্রে হয় তাঁদের অনুপ্রেরণা না হয় তাঁদের চিন্তাধারার দিক পরিবর্তনের দিশারী বা কাণ্ডারীরূপে বিবেকানন্দকে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলার এবং বাঙালির থেকে ভারত ভাবনায় বহুত্বের মধ্যে একত্বের উপলব্ধি করলেন, বিবেকানন্দের ইতিবাচক 'পজিটিভ' চিন্তার অনুসরণে, পরবর্তীকালে।অ ারবি বেকানন্দনি জেকি স্তুভ ারতবাসীকে(দশাত্মবোধে উদ্বোধিত করে দিয়ে নিজেকে—হিন্দু, ভারতবর্ষ—এ সমস্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে, আমাদের চিন্তার সীমাকে বিশ্ব পর্যন্ত প্রসারিত করলেন। তিনি বললেন, আমি কোন দেশ, কোন জাতির নই, সকলের, বিশেষ করে নির্যাতিত ও অবহেলিতের জন্য আমি। আমি নারীর এবং দরিদ্রের, কারণ তাদের জাগরণ, তাদের উন্নয়ন ব্যতিরেকে মানুষের উন্নতি সম্ভব নয়—সে বৃদ্ধি যতই ঘটুক জাতীয় আয়ের, এবং এমনকি সামাজিক ক্ষেত্রের। উন্নতির অর্থ মানবোন্নয়ন ও মানুষের চেতনার বিকাশ। নারী এবং গরিবের উন্নতি ব্যতিরেকে সে উন্নতি সম্ভব নয়।

বিবেকানন্দকে অবলম্বন করে মানুষ অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত হয়েছে, কাতারে কাতারে না হলেও, 'মুষ্টিমেয়' সেই সংখ্যক যারা জগতের ভাবকে বদলে দিতে পারে। তারা ত্যাগব্রতী আদর্শে গত একশ বছরের বেশি সময় ধরে রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসী হিসাবে যোগদান করেছে। সেই সন্ন্যাসীরা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে চলেছেন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। সন্ন্যাসীর ত্যাগব্রতী সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে কোন আদর্শকে অক্ষুণ্ণ

রাখা যায় না। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বেতনভুক উপাচার্যরা 'ভিন্নতর' যোগ্যতায় পদাধিকার লাভ করেছেন। তাঁদের কাছে আদর্শের প্রতি নির্বিশেষে আনুগত্য আশা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর প্রত্যেক নির্বাচিত উপাচার্য রবীন্দ্র ভাবনায় সমান ব্রতী হবেন এমন আশা বাতুলতা। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হয়নি। 'আগের মতো নেই' বাক্যবন্ধ বেলুড় মঠের ক্ষেত্রে নিতান্তই অপ্রযোজ্য। সেখানে 'সংঘজননী'র ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়েনি। হারানোর জন্য কোন নোবেল পুরস্কারও পাওয়া যায়নি।

বিবেকানন্দ একটি প্রবাহ। বেলুড় মঠ হয়ে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে যে সুরধ্বনি তার উৎস মানে বিবেকানন্দের জন্মলগ্ন নয়। তাঁর দক্ষিণেশ্বরে আগমন। সেই আগমনের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু সম্পন্ন হয়েছিল। 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা' তার অন্যতম। রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দির—1853 সালে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সে মন্দিরের পূজক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন 1856-তে। অতঃপর 1881-তে নরেন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে। মাত্র কয়েক বছরেই গুরুর সান্নিধ্যে নরেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হয়েছিলেন মানুষবোধের গবেষকে। মানুষকে আবিষ্কার করলেন তিনি দেবতা রূপে। মানুষের অন্তরে দেবতা বিরাজমান। কথার কথা নয়, রাজনীতি বা ভোটের কথা নয়। হৃদয় নিঃসৃত অশ্রু। ভালবাসা। মানুষের প্রতি এই ভালবাসায় অদ্বৈত বেদান্তের রূপ বদলিয়ে দিলেন তিনি। সন্ন্যাসীর শুষ্ক জ্ঞানবিচারে সিঞ্চন করলেন প্রেমের বারি—রামকৃষ্ণ নামের। শংকরের জ্ঞান, বুদ্ধের হৃদয় মিশে রচনা হল বিবেকানন্দ। বিজ্ঞান আর ধর্ম মিলে রচিত হল বিবেকানন্দ। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য ধারা এসে মিললো স্বামী বিবেকানন্দে। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নবীন রাজা' যিনি 'পুরাতনকে বিদায় দিলে না!' মানুষের কোন সংস্কারই কুসংস্কার নয়। মানুষের মধ্যে ভালমন্দ নেই। কেবলই ভাল! কেবলই প্রবাহিত হয়ে এগিয়ে চলা 'বিপরীত রাতাতুরা' উৎস পানে, সমুদ্র সন্ধানে।

বিবেকানন্দ শুধু ভারতবর্ষ নয়, মানুষকে এনে দিয়েছেন স্বাধীনতা—অত্যাচারিত না হওয়ার এবং অত্যাচার না করারও স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা একটা বোধ—মান আর হুঁশের বোধসম্পন্ন মানুষ অন্য কোন মানুষের উপর অত্যাচার করতে উদ্যত হতে অপারগ। অপরের উপর অত্যাচারও সে সহ্য করবে না। স্বাধীনতা তার অবশ্যম্ভাবী। 1897-এ স্বামীজী বলেছিলেন, আগামী পঞ্চাশ বছর দেশের উপাসনা, দেশের ধ্যানে বসো। তারপরই স্বাধীনতা। যোগ্যতা অর্জনে প্রয়াসী হও, সে স্বাধীনতা সংরক্ষার বিষয়। ব্রতী হও মানবোন্নয়নের শিক্ষায়। সে শিক্ষা লাভ করতে হয়। সে শিক্ষা দিতে হয়। Be and Make। প্রায়োগিক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। কেবল পুঁথিগত শিক্ষা নয়, সে শিক্ষা দেশের গরিব মানুষকে মানুষ জ্ঞানে বুকে টেনে নেবার শিক্ষা।

বিবেকানন্দের উৎস সন্ধানে অনেকে বলেন, বিবেকানন্দের আবার উৎস কী, তিনি নিজেই উৎস—রামকৃষ্ণকে পরিচিত করিয়েছিলেন জগতে। যদি ধরেও নিই যে জগতে পরিচিত করানো একটি বড় কাজ, ধরেও যদি নিই, 'ভগবান'ও পরিচয়ের

অপেক্ষায়, তথাপি সেই 'সাকার ভাবনায়' ডিম আগে না মুরগী আগে-র মতো বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণকে পরিচয় করিয়ে ছিলেন, না কি, রামকৃষ্ণ চিহ্নিত করেছিলেন বিবেকানন্দকে তাঁর সর্বস্ব দিয়ে 'ফতুর হয়ে'-সে কথার ঐহিক সমাধান অসম্ভব। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ধূলিমুষ্ঠি থেকে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সৃষ্টি করতে পারেন —হাজারে হাজারে।

বিবেকানন্দ একটি প্রধারা। গঙ্গার উৎস গোমুখ। বিবেকানন্দের উৎস রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণের সৃষ্টিমূলে দক্ষিণেশ্বর মন্দির, দক্ষিণেশ্বর মন্দির সৃষ্টি করেছিলেন রানি রাসমণি। রানিকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, অথবা রানির মনে স্বপ্ন জাগিয়েছিলেন ভবতারিনী মা কালী স্বয়ং। তাহলে বিবেকানন্দের উৎস কোথায়! গঙ্গা বয়ে গেছে দেড় হাজার মাইল পথ। বিবেকানন্দের ভাবনা (স্বামীজির নিজ মুখে কবুল) অন্তত দেড় হাজার বছরের জন্য। এই দেড় হাজার বছরে কি কি হবে, বরং তার একটা চিত্র আঁকা যায়, অক্ষম কল্পনার অক্ষয় লোকে—মানুষ যে অনন্তকে চিন্তা করতে পারে।

ভাবতে ভাল লাগবে যে 3013 সালে সমস্ত বিশ্ব পরিপ্লাবিত হবে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায়। এই ভাবনাটা অ-বিবেকী, অর্থাৎ বিবেকানন্দ সুলভ নয়। বিবেকানন্দ সুলভ ভাবনা হল, এই বিশ্বে বিশ্বময় নতুন নতুন ভাবনার স্ফুরণ ঘটবে। সেইসব ভাবনার কোথাও স্বামী বিবেকানন্দের নাম না থাকতেও পারে, কিন্তু তাঁর চিন্তাটা পল্লবিত হবে।

তখন তারে নাইবা আমায় ...

আমরা হয়তো চিনতে অথবা বুঝতে পারব না। যাঁরা ধ্যান করবেন তাঁরাই কেবল স্বামীজিকে খুঁজে পাবে সেই চিন্তার অভ্যন্তরে। তাঁরা হলেন তখনকার সন্ন্যাসী। রামকৃষ্ণ মঠ মিশন থাকবে তবে তার কাজটা মানবোন্নয়নের পাঠটা ঠিক বুঝতে পারবে না, কারণ গরিব মানুষের সেবার জন্য মঠ বিক্রি করার প্রয়োজন থাকবে না।

এখানে একটা 'অসহায়তা' আছে। মাদার টেরেসা যেটা কবুল করে ফেলে সাংবাদিকদের 'সমালোচনা'-র মুখে পড়েছিলেন। তবু কথাটা বলা দরকার। কথাটা হল, গরিব মানুষ না থাকলে সেবা করবার 'ভগবান' থাকবেন কোথায়, কি অবলম্বনে? মনের দারিদ্র, মনের অন্ধকার থাকবে, সেটা বড়লোকের বিলাস। মনের দারিদ্র (misery of mind)-এর সেবা কেবলমাত্র সাধুরাই করতে সক্ষম। তাহলে সাধারণ 'মুমুর্ষ' মানুষেরা কী? তারা কি বিজ্ঞানের 'সুখে' ভগবানের 'আনন্দ' ভুলবে। 'বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনায় মানুষের সীমানায়'?

ভগিনী নিবেদিতা ম্যাকলাউড-কে লিখেছিলেন 1897 সালে। এখন কিছুদিন বিবেকানন্দের চিন্তায় ভাঁটার টান লক্ষ্য করা যাবে। আবার তাঁর জন্মের দেড়শ বছর পর স্বামী বিবেকানন্দ জেগে উঠবেন। পিছিয়ে এসে বর্তমানে আমরা কি তার কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। সহজেই একদল বিবেকানন্দ বিরোধী এবং নঞর্থক ভাবনায় ভাবিত মানুষ বললেন, উত্তর হল, না। অপর দল, বিবেকানন্দ ভক্ত, তারা বলবেন,

হ্যাঁ। আমরা বুঝবার চেষ্টা করব 'না' এবং 'হ্যাঁ'-র মাঝখান দিয়ে। যারা 'না' বলবেন, তাদের প্রতি প্রশ্ন, 'হ্যাঁ' কোনটি আপনার বিবেচনায়। কিসে ভালো হয়? সেই উত্তরটির প্রসঙ্গে আপনার আগ্রহ কতটুকু? ত্যাগ স্বীকার কী? না, না, আপনি ঠিক কি ভুল বলছি না। বস্তুত 'ভুল' বলে কিছু হয়ই না। কেবল 'মন মুখ এক করা'—নাস্তিকের দায়িত্ব অধিকতর।ত থাকথিত' আস্তিক'ব ্যক্তিভ গবানেরঘ াড়েদ ায়িত্বদি য়ে(রহাই(পতে চাইবেন কিন্তু নাস্তিককে তো নিজের কাঁধে দায় নিতে হবে। নিজেকে মিথ্যাচারি, পল্লবগ্রাহী, অলস, অকর্মণ্য, সমালোচক দেখতে কোন মানুষই চাইবেন না।

বাকি রইলেন, 'ভক্তেরা'- তারা 'না' বলবেন না, বলতে নেই বলে। কিন্তু আচরণ করবেন নঙর্থক। যেটা আরো মারাত্মক। অধিকাংশ ভক্তই ভণ্ড। বিবেকানন্দের ভক্তও ব্যতিক্রম নন। তাদের সব গুণই (দোষ-ই) আছে। মাঝখান থেকে তারা 'তক্মা' নিয়ে নিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াবার। সাধুরা তাদের কিছু বলবেন না, সাধুদের বলতে নেই। তারা অপরিগ্রাহী। সেবামাত্র করেন, প্রত্যাশা রাখেন না। ফলত রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ভক্তেরা অত্যন্ত প্যামপার্ড তাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন, 'প্রসাদ পান', বেরিয়ে বেড়ান—পুরী, ভুবনেশ্বর, কন্খল আর দেরাদুনে, ওদিকে কালাডি।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রত্যাশা না করুন, অন্তত আচরণবিধি যদি রচনা করে দিতেন ভক্তদের জন্যও তবে অন্তত উন্নতি বই অবনতি হোত না অন্তত ভক্তদের নিজেদের। পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজেরা মন্ত্র দীক্ষা দিয়ে ময়দানে স্বাধীন বিচরণের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন, আর পুরনো অভ্যাসের পানা ঘিরে ফেলেছে ভক্ত হৃদয়। অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানে মন্ত্র দীক্ষা নেওয়ার পরে নিয়ম করে পয়সা কড়িও দিতে হয়। রামকৃষ্ণ মিশনে যা কিছু পাঠপয়জার দীক্ষার আগে। দীক্ষালাভের পর আর কেউ বলবেন না, আপনার কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য, কিছু ত্যাগ করবার প্রয়োজন বাকি ছিল। এ কথা ভক্তদের সঙ্গে মেলামেশা, যাতায়াতের পরে বেশ বুঝেছি, রামকৃষ্ণ মিশনে 'প্যালা দিতে হয় না বলে সুবিধা'।

বিবেকানন্দ ধারা বহিবে ভুবনে—জোয়ার, কি ভাঁটা সেটা বোঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই। হয়তো জোয়ার এসেছে, কারণ পরিপার্শ্বে যা দেখছি সেটাই বিশ্ব নয়। কান পাতলে ধ্যানের গভীরে এমন সব ঘটনা অনুভূত হবে যা অভাবনীয়। সেই ঘটনা প্রবাহে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজি নামে 'চেয়ারে'-র সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবপ্রচার পরিষদে যুবকযুবতীদের অংশগ্রহণ কোন অমোঘ আগ্রহে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। আমরা যারা দেশের গ্রামে গঞ্জে প্রান্তের যোগোদ্যান মঠের 'শাশ্বত ভারত' অথবা 'বিবেকবাহিনী' নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেয়েছি তারা দেখেছি, গঙ্গার তীরে কোথাও দেবালয়ের ঘণ্টা তো কোথাও শ্মশানের চিতা-র মতো, কোথাও মানুষের ঢল, কোথাও শূন্য প্রান্তর—ধু ধু প্রান্তরে একলা রথ দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিবেকানন্দের উৎস দারুণ কর্মকোলাহলের অভ্যন্তরে নিষ্কাম ধ্যানমগ্নতার; এবং নিঃসীম স্তব্ধতার অন্তরে অপরূপ কর্মানুষ্ঠানে। বিবেকানন্দ বাইরের সাকার মূর্তিতে নয়, অন্তরের পরম আকুলতা আগ্রহ এবং ভালবাসায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ অবদান—ভিন্ন ভাবনা

দেবনারায়ণ ইন্দু

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিশ্বমানের রচনা সম্ভার রেখে গেছেন। অনন্যপ্রতিভারস্পর্শেতাঁরক বিতা,গান,ছোটগল্প,নাটক,প্রবন্ধ—সবইবিশ্বমানে পৌঁছেছে।

তাঁর কবিতায় পাই উপনিষদের বাণী, বাউল ও সুফি জীবনবাদ, বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদ, বিশ্বমানবতার ঔদার্য, সুন্দর ও মঙ্গলের পূজার উদাত্ত স্বর। রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম অধ্যায় উপনিষদের দর্শনে প্রতিষ্ঠিত। পরে তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্বমানবতাবাদের প্রবক্তা। এই দুই পর্যায়েই তিনি আস্তিক্যবোধে এবং ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় স্থিত। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি হয়ে ওঠেন সংশয়ান্বিত; সে সময়ে তাঁর লেখায় কোয়ান্টাম দর্শনেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর গানের সুরে ভারতীয় মার্গসঙ্গীত, পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, বাংলার লোকসঙ্গীত এবং বাউল ও কীর্তনের প্রভাব এবং সুসমঞ্জস প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর গানে ছিল কথা ও সুরের অপূর্ব মেল-বন্ধন। সমন্বয় সাধন ছিল অভূতপূর্ব। তাঁর নৃত্যনাট্য রচনাও ছিল নতুন ধারার। সেখানে তিনি আঞ্চলিক নৃত্যধারা ব্যবহার করেছেন। ভারতনাট্যমের মুদ্রার প্রয়োগে তাঁর নৃত্যনাট্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বিপুল বিচিত্র রচনাসম্ভার বিশ্বের অমূল্য কালজয়ী সম্পদ। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে বাংলা ভাষা বিশ্বের দরবারে পেয়েছে সম্মানের স্থান। চিত্রকলাতেও তাঁর প্রকাশভঙ্গি ছিল একান্তভাবে স্বকীয়। এটা হল তাঁর অশিক্ষিত পটুত্ব—ক্ষেত্রবিশেষে শিশুসুলভ সরলতাপূর্ণ এবং একান্তই তাঁর কবিসত্তা দ্বারা প্রভাবিত। ফলে তাঁর ছবি এক রহস্যময়তার আবরণে ঢাকা। এই মানুষই আবার বহুমুখী চিন্তায় নিমগ্ন হয়েছেন, নানাবিধ কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত করেছেন নিজেকে। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষটি বাংলায় বিজ্ঞানের বই লিখলেন। বিজ্ঞান মানুষকে কোন পথে নিয়ে যাবে তাই নিয়ে বিশ্বের নানা দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হয়েছেন এবং সেখানেও রয়েছে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার সুস্পষ্ট ছাপ। স্থাপনা করেছেন শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন। বাঙালি হিসাবে তাঁর এই কর্মযজ্ঞ বাংলা ভাষাকে ও বাংলাকে বিশ্বের দরবারে এক অত্যুচ্চ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে এবং তাঁর এই সার্বিক কর্মের ফসল মানব সমাজের জন্য হয়ে থাকবে মহার্ঘ সম্পদ।

তাঁর বিশাল ও বিচিত্র সৃজন ও মহান কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনটি বাংলা ভাষা বা বাঙালির বা বাংলার প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান? কবিতা-না, গান-না, ছোটগল্প—তাও না। বাংলার প্রতি, বাঙালীর প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান বাংলা ভাষা। রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন তার আগেই বাংলা ভাষায় বেশ কিছু প্রতিভাবান লেখকের আবির্ভাব হলেও লিখিত বাংলা ভাষা ছিল সংস্কৃতবহুল। লিখিত ও কথ্য ভাষার মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রচুর। কথ্যভাষা যথেষ্ট মার্জিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষার বেড়াজাল ভেঙ্গে নতুন ভাষা সৃষ্টি করলেন। যা এখন ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে একটি প্রমিত বাংলা ভাষায় পরিণত হয়েছে। "... সেইরূপে ভাষাপথ খননি স্ববলে ..." এ-কথা কাশীরাম দাশের ক্ষেত্রে যেমন একদিক থেকে প্রযোজ্য, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, সাবালকত্ব পায়। তাঁর দীর্ঘজীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনার বিচিত্র পথে বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করার মতো। প্রচলিত পথ ছেড়ে মুক্ত চিন্তার পথে গিয়ে তিনি বাংলা ভাষার নিজস্বতা প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা ভাষার গতিময়তা লক্ষ্য করি তাঁর *গল্পে*—পোস্টমাস্টার, জীবিত ও মৃত, সে, চার অধ্যায়, রবিবার, ল্যাবরেটরি। *প্রবন্ধে*—চারিত্রপূজা, সভ্যতার সঙ্কট। *কবিতায়*—বাঁশি, সাধারণ মেয়ে, নিষ্কৃতি, আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, রূপনারাণের কুলে, তোমার সৃষ্টির পথ। শেষের কবিতার টলটলে ভাষায় অমিত ও লাবণ্যের প্রেমালাপে। তাঁর ভাষার প্রয়োগে লিখিত ও কথ্য ভাষার ব্যবধান গেল কমে। সব মিলে তিনি আমাদের দিয়ে গেলেন এক অপূর্ব অমূল্য উপহার—ঝরঝরে একটি ভাষা যা ব্যবহার করা হল বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ও ব্যবহারিক জগতের বিভিন্ন আঙিনায়। তিনি নিজেই ব্যবহার করে গেছেন এর কয়েকটি দিকে। এই ভাষাই আজ কলকাতা আর ঢাকা—বাংলা ভাষার দুই ভরকেন্দ্রের ভাষা। লিখিত ভাষার উত্তর-দক্ষিণের ব্যবধান মুছে গেছে। উচ্চারণের তফাৎ ছাড়া কথ্যভাষাও প্রায় এক হয়ে আসছে। তাই বলা যায় আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই কথা বলি। রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি হিসেবে বাংলা ভাষাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরি, বিনয় মুখোপাধ্যায় (যাযাবর) এবং সৈয়দ মুজতবা আলি। এঁদের কলমে বাংলা ভাষা আরও গতিবেগ পেয়েছে। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়—তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মানিক-তো আছেনই। আর পেয়েছি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শিবনারায়ণ রায় ও অন্যান্য প্রবন্ধকারদের। এঁরা সবাই কিন্তু সেই রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষাকেই সমৃদ্ধ করেছেন।

বাঙালি বাংলা ভাষা নিয়ে গর্ব করতে পারে, বলতে পারে—গীতাঞ্জলি যে ভাষায় লেখা, সেই ভাষাই আমার ভাষা।

রবীন্দ্রনাথের যে আর একটি দিক নিয়ে বলতে চাই তা হল তাঁর সমাজভাবনা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর পর তিনি পরিকল্পনা করলেন শ্রীনিকেতনের। গ্রামোন্নয়নের কাজ করলেন বোলপুরের পাশে সুরুল গ্রামে।

বিশ্বমানবতার প্রতীক, মানুষের আত্মিক উন্নতির অত্যাবশ্যকতার চিন্তার ধারক ও বাহক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন নন। উপার্জনের প্রয়োজন এবং তার সুযোগ ও ব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি সচেতন। পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে মানুষকে স্বাবলম্বী এবং উপার্জনক্ষম করে তোলার সুযোগ সুবিধা করে দেবার জন্য শ্রীনিকেতন। গ্রামোন্নয়োনের প্রথম ধাপেই তিনি আরম্ভ করলেন নির্মলীকরণ (sanitation) এবং প্রাতিস্বিক (personal) স্বাস্থ্যবিধি শেখানোর ব্যবস্থা—নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে। চাষের ফলন উন্নত করার জন্য নিয়ে এলেন আদর্শবাদী তরুণ কৃষি বিজ্ঞানী Leonard Elmhirst-কে। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে পাঠালেন কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিজ্ঞান পড়তে। নির্মলীকরণ ব্যবস্থা শেখানোর জন্য শুধু ব্যবস্থা নয় কর্মীও নিয়োগ করলেন। একদিন কর্মী পাওয়া গেল না, Elmhirst নিজে পায়খানা পরিষ্কার করতে নেমে পড়লেন। এটা পাশ্চাত্যের মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের বাস্তবধর্মী কর্মজীবনের গুণগুলিকে প্রাচ্যের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের কর্মনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা ও স্বাবলম্বী জীবনযাপন পদ্ধতি তিনি এদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ শুধুই চিন্তার জগতে উন্নত হলে হবে না, চিন্তার বাস্তব প্রয়োগ আনতে হবে বাস্তব জীবনে। এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মনে আসে বিবেকানন্দ ও গান্ধির কথা। তিনজনই এক যুগের মানুষ। জীবনকে তিনজন দেখেছেন তিন দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু জীবনদর্শনের ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে যে মিল তা সুস্পষ্ট। আজ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ নিয়ে আলোচনা হয় প্রচুর। গানের মেলা হচ্ছে চারিদিকে। কিন্তু তাঁর কর্মমুখী জীবন নিয়ে তো তেমন আলোচনা শুনিনা। সেটা হওয়া খুব জরুরি।

আমার মতে গৌতম বুদ্ধ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান (intellectual) ব্যক্তিত্ব। কারণ তিনি অতি কম বয়সে মানুষের (প্রাণিমাত্রেরই) নশ্বরতা ও জীবনের সুখ-দুঃখের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করে সেই উপলব্ধিকে জীবনচর্চায় প্রতিফলিত করেছিলেন। জ্ঞান, উপলব্ধি হয়তো আরও কারও কারও হয়েছিল। কিন্তু জীবনে তার চর্চা ও প্রতিফলন কজনের? তেমনই রবীন্দ্রনাথ শুধু ভাবুক কবি মাত্র নন, শুধু গীতিকার বা সুরকার নন, কেবল সাহিত্যিক নন—তিনি ছিলেন একজন বহুগুণান্বিত ব্যক্তি (myriad minded man)। শুধু চিন্তায় নয় কাজেও অগ্রণী। আজ বাঙালি রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে মেতেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কর্মনিষ্ঠা এবং রবীন্দ্ররচনা সম্ভারের বৌদ্ধিক চর্চা সে তুলনায় অনেক কম।

মূল রচনাটি 18 মে 2012 জলপাইগুড়িতে সমতট আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসব সভায় পঠিত হয়। স্বল্প পরিমার্জন করে লেখাটি ছাপা হোল। স.স.

রবীন্দ্রনাথের কৃষিদর্শন : মূল্যায়ন ও প্রাসঙ্গিকতা

দেবারতি জানা

রবীন্দ্রজীবনে তিরিশের পরে মানবতাবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর কাব্যই এর প্রমাণ। কিন্তু কেবল কাব্যের মধ্যে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা লিখলেই যে তা দূরীভূত হয় না, একথা কবি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই মানুষ হিসেবে তাঁর দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি চেয়েছিলেন বাস্তবে এমন কাজে আত্মনিয়োগ করতে যাতে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার একটা পথ পাওয়া যায়। সেই পথের সন্ধানে বেরিয়ে কবি খুঁজে পান স্বপ্ন ও ভাবনাকে রূপদানের সুযোগ। শিলাইদহ ও পতিসরে (অধুনা বাংলাদেশ) পৈত্রিক সম্পত্তি দেখাশুনার ভার পড়ে 1880 সালের ডিসেম্বর নাগাদ, কবির বয়স তখন মাত্র উনিশ। সেখানেই তাঁর গ্রাম-বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তাঁর আসমানদারি পেশা তাঁকে আকৃষ্ট করে এখানকার দিগন্তব্যাপী প্রান্তর, ধানক্ষেত, ছায়াসুনিবিড় কুঁড়েঘর আর তাঁর জমিদারি পেশা এলাকার মানুষগুলোর সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ থেকে গ্রাম-বাংলার চরিত্র বুঝতে সক্ষম হয়। আর এসবই তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তাই ক্রমে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন কীভাবে মানুষগুলোর মন জাগিয়ে তুলবেন যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের পরিত্রাতা হয়ে উঠতে পারে। এই কাজে তাঁর প্রথম প্রয়োজন ছিল ওই এলাকার আর্থিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা, সেইসঙ্গে সমাধানের পথও অনুসন্ধান করা। মূলত শুষ্ক জলবায়ু ও খোয়াই মৃত্তিকার এই অঞ্চলে কৃষিতে নিযুক্ত প্রায় সবকটি পরিবারই ছিল ঋণগ্রস্ত, সেইসঙ্গে উপরিপাওনা ছিল ম্যালেরিয়া ও মন্বন্তর। সুতরাং, কবির ব্যক্তিগত উদ্যোগে এইসকল সমস্যার সমাধান খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। তবে তিনি হাল ছাড়েননি, সীমিত পরিসরে সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে একমাত্র কালীমোহন ঘোষকে সঙ্গী করে এগিয়ে আসেন কৃষির উন্নয়নে, কৃষকের পোক্ত ভবিষ্যৎ নির্মাণে। আজ কৃষি এবং কৃষক-সমাজ দুই-ই যখন সঙ্কটের সম্মুখীন তখন রবীন্দ্রনাথের পদক্ষেপ এবিষয়ে কতদূর প্রাসঙ্গিক তা স্মরণ করা জরুরি।

কৃষির উন্নতি নিবিড়ভাবে জড়িত প্রকৃতি, প্রযুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এগুলির গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। তিনি রাঢ় বাংলার ভূপ্রকৃতিকে গ্রহণ করে চেষ্টা করেন সেখানে প্রযুক্তি ও আধুনিক কৃষিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটাতে। সাহিত্যের কল্পনা-বিভোর মন কৃষিক্ষেত্রে পরিগ্রহ করে বিজ্ঞানমনস্কতা, সংস্কার করেন চিরাচরিত কৃষিপদ্ধতির। যখন উচ্চশিক্ষার্থে ইংল্যান্ড ছিল ভারতীয়দের কাছে গন্তব্যস্থল, তখন

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ 1906 সালে প্রেরিত হন আমেরিকার ইলিনয় (Illinois) বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে পশুপালনবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নে। পরের বছর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও কবি একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এসবই কবির পাশ্চাত্যদেশে অনুসৃত কৃষিবিজ্ঞানকে জানার আগ্রহ ও তা দেশীয় পরিস্থিতিতে প্রয়োগের সদিচ্ছাকেই প্রতিভাত করে। রবীন্দ্রনাথের কর্মপদ্ধতি কত পরিকল্পিতছি লত াধ রা পড়ে পরবর্তীকালেত ঁারস ঙ্গে যাগে দওয়া Elmhirst-এর কথায়, "When Dr. Tagore handed over to us his farm at the Surul in the Birbhum district, as the basis of our operations for the founding of a school of Agriculture and the study of village economics, we were compelled to examine not merely the conditions of the soil around us, but the history, social, economic and political aspects which lay behind that conditions."[1] কারণ কবি লক্ষ করেছিলেন শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, আনন্দ নেই, সক্ষমতা সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতাও নেই। ফলত গ্রামগুলি ক্রম-অবক্ষয়ের চরম শিকার। অথচ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির সঙ্গে যে গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত তা তিনি বুঝেছিলেন। আর তাই প্রতিটি সমস্যা পৃথকভাবে বিবেচনা না করে সামগ্রিকভাবে বিচার করা জরুরি বলেই মনে করেন তিনি। তাই এখানে কাজের লক্ষ্য ছিল, "to survey the economic, social and scientific needs of the cultivator in his home, village and fields, and secondly to carry out our own laboratory experiments in health, education, craft, cultivation and animal husbandry."[2] শান্তিনিকেতন যদি হয় বৌদ্ধিক জগতের দারিদ্র্য মোচনের প্রয়াস, তবে শ্রীনিকেতন পার্থিব দারিদ্র্য মোচনের গবেষণাকেন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে-দারিদ্র্য গ্রামবাসীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে কেবল হাতদুটো দিয়ে কাজ করলে হবে না, বিজ্ঞানের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। তাই আন্তরিকভাবে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন প্রথাগত কৃষিব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ঘটাতে। প্রথমেই চেষ্টা করেন ঐ অঞ্চলের মাটিকে কীভাবে সবুজ করে তোলা যায়; ভূমিক্ষয় রোধ করা যায় এবং বাতাসের আর্দ্রতা রক্ষিত হয়। তার জন্য বনসৃজন প্রক্রিয়া শুরু করেন। প্রতীকী এই প্রক্রিয়া গ্রামবাসীর কাছে তুলে ধরা হয়েছিল বৃহৎ উদ্যোগে তাদের আগ্রহী করে তুলতে।

দ্বিতীয়ত কবি অনুভব করেছিলেন, ''চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।"[3] এখান থেকে স্পষ্ট যে তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন—টুকরো জমি এবং হাল-লাঙল নিয়ে চাষ। তিনি 1930-এ রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন 'ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র', যেখানে ছোট ছোট জমিগুলি একত্রে মিলিয়ে দিয়ে ভালো

জাতের ও অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হচ্ছে, সেই সঙ্গে ছোট ক্ষেতের মালিকদের পক্ষে যে যন্ত্র কেনা সম্ভব নয় তা ব্যবহার করা যাচ্ছে, কারণ টুকরো জমিতে যন্ত্রের ব্যবহার অসম্ভব। অথচ কবি অনেক আগেই তাঁর জমিদারিতে এসে এই সত্যটি অনুধাবন করেছিলেন, ''কারো বা দুই বিঘা জমি, কারো বা চার, কারো বা দশ। জমির ভাগগুলি সমান নয়, সীমানা আঁকাবাঁকা। যদি প্রত্যেক চাষা কেবল নিজের ছোটো জমিটুকুকে অন্য জমি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া না দেখিত, যদি সকলের জমি এক করিয়া সকলে একযোগে মিলিয়া চাষ করিত, তবে অনেক হাল কম লাগিত, অনেক বাজে মেহনত বাঁচিয়া যাইত। যদি অনেক চাষী মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও এক জায়গা হইতে বেচিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত।''[৪] শুধু তাই নয় তিনি একদিন কৃষকদের ডেকে এ বিষয়ে আলোচনাও করেন। কৃষকরা তখনই সমস্ত মেনে নিলেও কবিকে জানান, তাঁরা নির্বোধ, এতবড়ো ব্যাপার কীভাবে করে তুলবেন। কবির আক্ষেপ, ''আমি যদি বলতে পারতুম, এ ভার আমিই নেব, তা হলে তখনই মিটে যেতে পারত। কিন্তু ... সে শিক্ষা, সে শক্তি আমার নেই।''[৫]

তৃতীয়ত হাল-লাঙলের পরিবর্তে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করলে শ্রম এবং সময় দুই বাঁচবে, তাই পরবর্তীকালে রথীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হন। তখনও এদেশে ট্রাক্টরের প্রচলন না হওয়ায় চালক পেলেন না, প্রথমে নিজেই চালাতে শুরু করেন, কিছুদিনের মধ্যে গ্রামের একটি ছেলেকে প্রশিক্ষণ দেন। ক্রমে গ্রামবাসীরা যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন।

চতুর্থত কবি নজর দিলেন ফসলের প্রকৃতি বিচার ও তার মানোন্নয়নে। ঐ অঞ্চলে পূর্বেই উৎপাদিত ফসলের বিভিন্ন প্রজাতি নিয়ে এবং নতুন ফসল নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয় শ্রীনিকেতনের গবেষণাগারে। জমির ফলন বাড়ানোর লক্ষ্যে crop rotation ও crop diversification পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়। আমেরিকা থেকে উন্নত ভুট্টা বীজ, মাদ্রাজ থেকে ভালো ধান আনিয়ে এখানে লাগানোর ব্যবস্থা করেন। কৃষকদের আলু, আখ, টম্যাটোর চাষে উৎসাহ বাড়ে। শিলাইদহে সহজে কাজ করা গেলেও পতিসরে কাজ করা খুবই দুরূহ। কারণ সেখানকার মাটিতে রবিশস্য কিছুই হত না এমনকি বর্ষার কয়েকমাস ছাড়া গাছপালাও জন্মাত না। তা সত্ত্বেও কবি ঐ অঞ্চল নিয়ে চিন্তা করে গেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন প্রজাদের বাস্তুবাড়ি, ক্ষেতের আল প্রভৃতি স্থানে আনারস, কলা, খেজুর ফলাদির চাষে উৎসাহী করতে। এই চাষও যে নিরর্থক তা নয়, কারণ আনারসের পাতা থেকে মজবুত সুতো হবে এবং ফলও বিক্রয়যোগ্য। আলু চাষেরও প্রচলন করা যায় কিনা চিন্তা করেছেন, আমেরিকার ভুট্টাবীজ পুনরায় পরীক্ষা করতে বলেছেন।

পঞ্চমত জমির উৎপাদন বাড়াতে কম খরচে জৈব সারের ব্যবস্থা করেন রথীন্দ্রনাথ। অন্যদিকে দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের অভাব মেটাতে ধর্মগোলা স্থাপন, ধানভানা কল প্রচলন এসব চিন্তাও করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

ষষ্ঠত কৃষিপদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ তখনই সম্ভব যখন কৃষক তদুপযোগী হবে। তাই কৃষকদের আধুনিক কৃষিপদ্ধতি ও প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কবিপুত্র সহ অন্যরা দেশে ফিরে কৃষকদের বোঝাতে শুরু করেন কীভাবে বৈজ্ঞানিক ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। কারণ, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন উন্নত কৃষক। নানাভাবে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা ছিল অন্যতম লক্ষ্য। মহাজনদের কাছে কৃষকরা ঋণগ্রস্ত ছিলেন। ঐ অঞ্চলে বছরে একবার চাষ হত তার ওপর অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হত। ফলে কৃষকদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে চড়া সুদে ঋণ নিতে হত। উপরন্তু জমিদারকে খাজনাও দিতে হত। এসবের কবল থেকে কৃষককে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর কবি স্থাপন করেন সমবায় ব্যাঙ্ক। শিলাইদহে 1894-তে এবং পতিসরে 1905-এ ব্যাঙ্ক চালু হয়। শুরুতে নিজের ও আত্মীয়দের থেকে টাকা জোগাড় করে ব্যাঙ্ক চালু করার পর 1913-তে নোবেল পুরস্কার পেয়ে সেই টাকার কিছু অংশ পতিসর ব্যাঙ্কে দান করেন। বেশি সংখ্যক কৃষককে কম সুদে ঋণ দেওয়ার কারণেই এই প্রয়াস। এই ব্যাঙ্ক চালু হওয়ায় বহু গরিব চাষি প্রথম সুযোগ পান ঋণমুক্ত হওয়ার। আর এই ব্যাঙ্ক তৈরির পূর্বেই সমবায় সমিতি-র মাধ্যমে কৃষকদের স্বল্প-সঞ্চয়ে আগ্রহী করেন যাতে ঐ সঞ্চয় থেকেই গরিব কৃষকদের কম সুদে ঋণ দেওয়া যায়।

সপ্তমত কৃষকদের ভাগ্য নির্ভর থেকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে কবি উদ্যোগী হন তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সার্বিক উন্নয়নে। সমাজের কোন অংশ আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর হলে তা অন্যান্য অংশকেও প্রভাবিত করে। তাই তিনি চাইতেন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমন হবে যাতে দেশবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে তার যোগ ঘটে। সেই চেষ্টার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস শ্রীনিকেতন, যেখানে কৃষকদের কেবল শিক্ষা নয় তাদের কৃষির পাশাপাশি কিছু সমান্তরাল আয়ের পথ খুলে দেওয়ার ব্যবস্থাও হয় হস্তশিল্প, বিভিন্ন কুটিরশিল্প, বয়ন শিল্প, মৎস্য চাষ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে পশুপালনে প্রশিক্ষণ দিয়ে। এছাড়া pottery-কে কুটির শিল্পের আওতায় আনা যায় কিনা সেই চিন্তাও করেছিলেন কবি। কারণ পতিসরে ধান ভিন্ন অন্য কোন ফসল ফলত না, সুতরাং শক্ত এঁটেল মাটিকে বিকল্প আয়ের মাধ্যমে করে তুলতে আগ্রহী হয়েছিলেন। দেশে দারিদ্র্যের মূলে কেবল জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অবনমনও অন্যতম কারণ। শিক্ষা সহ বিভিন্ন কাজে দক্ষ হলে তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া কৃষকদের চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে ডাক্তার সহ ডিসপেনসারি চালু করেন। গ্রামের কৃষকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শৌচালয়, পানীয় জল সহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত ছিল জমিদারির প্রতি বিভাগের 'হিতৈষী সভা', যেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধির নেতৃত্বে এই সকল পরিকল্পনা রূপায়িত হত।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যন্ত্রায়ন ও assembly-line production মানুষের জীবন থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। তাই কৃষির উন্নতিতে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যন্ত্রের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছিলেন সত্য, তবে তাঁর সকল প্রয়াসের মূলে ছিল নান্দনিক বোধ। তাই প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়ে সূচনা করেছিলেন বর্ষামঙ্গল, নবান্ন, বসন্ত উৎসব, হলকর্ষণ, বনমহোৎসব। পরিকল্পনা করেছিলেন কৃষিমেলার, যেখানে নাচ-গান-নাটক প্রভৃতির পাশাপাশি থাকবে প্রয়োজনীয় বিষয়ে বক্তৃতা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।[৬] লোকশিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষকে ভিতর থেকে জাগিয়ে তুলতে আয়োজন করা হত যাত্রা, কথকতার। কবির বিশ্বাস এভাবেই মানুষের গ্রহণক্ষমতা, বোধগম্যতা, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাবে। কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল অন্যে উন্নতি করে দেবে না, নিজেরাই নিজেদের উন্নতি করবে—এই বিশ্বাস যেন কৃষকদের মধ্যে জাগ্রত হয়। আর জাগ্রত হয় এই বোধ, ''পরস্পরে মিলিয়ে যে মানুষ সেই মানুষই পুরা, একলা মানুষ টুকরা মাত্র।''[৭]

জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকার মানসিকতা কবির ছিল না। তিনি জানতেন, জমিদার ''জমির জোঁক, ... পরাশ্রিত জীব। ... পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস'' করে তোলেন। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদাররা যে রাজস্ব আদায়কারী তহশিলদারে পরিণত হয়েছিলেন, তাঁরা এর পূর্ণ সুযোগও গ্রহণ করেছিলেন। তাই জমিদারদের প্রজাপীড়ন চরমে উঠেছিল। তিনি এও জানতেন এর মধ্যে না আছে পৌরুষ, না আছে গৌরব। তাই এই পরাশ্রিত জীবদের হাত থেকে মুক্তি পেতে তাঁর দাওয়াই সর্বাগ্রে নিজেকে বাঁচাতে হবে, ''যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না তাকে কোনো আইন বাঁচাতে পারে না। নিজেকে বাঁচাবার এই শক্তি আসে জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোন খাপছাড়া প্রণালীতে নয়।''[৯] জমিদার রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা সম্ভব হয়েছিল কারণ ''তিনি কবি হিসাবেও যেমন জমিদার হিসাবেও তেমনি unique।''[১০] তাঁর কর্মযজ্ঞে অর্থ, উদ্যম, পরিশ্রমের যথেষ্ট অপব্যয় হলেও একেবারে নিস্ফল হয়নি। কৃষকদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল। তবে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে কবি যে 'মণ্ডলী-প্রথা'[১১] গড়ে তুলেছিলেন শিক্ষিত জোতদার প্রজা ও আমলাতন্ত্র তাতে বাধাদানে উদ্যত হয়। কবি গ্রামে গ্রামে ঘুরে চেষ্টা করেন প্রজাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার। তবুও শেষরক্ষা হয় না। আমানতকারীরা টাকা চাইতে থাকেন, ইতিমধ্যে কবিকেও সাহিত্যের কাজে, দেশের কাজে মনোযোগী হতে হয়। ফলে জমিদারি হয় গৌণ, 'মণ্ডলী-প্রথা'-র বিরাট আয়োজন স্তব্ধ হয়ে যায়।

বর্তমান ভারতের কৃষিচিত্র প্রসঙ্গে কবির কৃষিভাবনা : স্থানীয় ও বিশ্বজনীন জ্ঞান আহরণ করে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন ঘটানোই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। সেই সূত্রে তিনি আজও প্রাসঙ্গিক। অবাক হতে হয় একজন কবি হয়ে কী করে এত কিছু

পরিকল্পনা করলেন। ভারতে কৃষির বর্তমান চিত্র পর্যালোচনা করে বিশ্বব্যাঙ্ক কিছু সমস্যা চিহ্নিত করেছে, "slow agricultural growth is a concern for policy makers ... current agricultural practices are neither economically nor environmentally sustainable and India's yields for many agricultural commodities are low. Poorly maintained irrigation system and almost universal lack of good extension services are among the factors responsible. Farmer's access to markets is hampered by poor roads, rudimentary market infrastructure, and excessive regulation."[12] শুধু তাই নয় কৃষিতে উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়ার মূলে রয়েছে আরও কিছু কারণ—

(ক) জমির গড় আয়তন খুবই ছোট

(খ) আধুনিক কৃষিপদ্ধতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার অপর্যাপ্ত, কারণ হয় ঐসব পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা নয় ব্যয়সাপেক্ষ তাছাড়া টুকরো জমিতে ঐ পদ্ধতি প্রয়োগে অসার্থকতা।

(গ) অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, জলের জোগানে ঘাটতি, জমি-সংস্কার প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রিতা।

(ঘ) কৃষকের সাক্ষরতার অভাব, আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণি।

(ঙ) আর্থিক বিনিয়োগ অপর্যাপ্ত।

এইসব কারণে ভারতে এখন এক জ্বলন্ত সমস্যা কৃষকের আত্মহত্যা। প্রায় 60% মানুষক ৃষিরস ঙ্গেপ্রত্যক্ষব া পরোক্ষভাবেয ুক্ত।ব ৃষ্টিরঅ ভাব,খ রা,ম ধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিদের অত্যাচার, ফসলের উপযুক্ত দাম না পাওয়া, ঋণের বিপুল বোঝা, শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতা ও অর্থনীতির প্রসারে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির পশ্চাদপসরণ—এসব আত্মহত্যা বাড়াচ্ছে। এই পরিবর্তিত অর্থনীতিতে কৃষকেরা কীভাবে বেঁচে থাকবেন সে বিষয়ে তাঁরা ওয়াকিবহাল নন, এমনকি দ্রুত পরিবর্তিত বীজ ও কীটনাশকের সঙ্গেও তাল মেলাতে সমস্যার সম্মুখীন তাঁরা। তার উপর রয়েছে বিকল্প আয়ের অনুপস্থিতি, কৃষি-helpline, কৃষিমুখী প্রকল্প বা অনুদানের অপ্রতুলতা। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। অথচ আজ থেকে শতাধিক বৎসব পূর্বে একজন কবি, জমিদার হিসেবে কেবল তাঁর সদিচ্ছা আর দূরদর্শিতা সম্বল করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যে কাজে, আজ বহুলাংশেই তার কার্যকারিতা নিয়ে কোনো সংশয় নেই।

অপর এক সমস্যা আজ ভাবিয়ে তুলেছে, কৃষি এবং শিল্পের দ্বন্দ্ব। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগমন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। যন্ত্রশিল্পের প্রসার সেই চাহিদাকেই সমর্থন করে। তাই বলে কৃষিশিল্পের অবনমন কাম্য নয়, কারণ চার দশকে সবুজ বিপ্লবের ঢেউ ভারতে যত দেশি জাতের ধান নিশ্চিহ্ন করেছে, হাজার হাজার বছরের প্রাকৃতিক বিপর্যয় তা পারেনি। তাই কৃষিকে অবহেলা করলে ক্রমবর্ধমান

মানুষেরখ াদ্যেরচ াহিদা পূরণে যমনস ঙ্কটে তরিহ বে তমনইস ভ্যতারভ ারসাম্য বিঘ্নিত হবে। কিছু জীবনদায়ী ঔষধ যাদের উৎস একান্তভাবেই প্রকৃতি তাদের গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতির বদলে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রস্তুত অনেক লাভজনক। জিন প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক না কেন খাদ্যশস্যের জন্য আমাদের কৃষিজমির ওপর নির্ভর করতেই হবে। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বার্তা দিয়ে গেছেন, ''... প্রকৃতির দ্বারা যেটুকু করিবার, তাহা আমাদের দ্বারা কোনমতেই হয় না, অতএব মানুষের সমস্ত ভালো কেবল আমরা বুদ্ধিমানেরাই করিব এমন পণ না করিয়া প্রকৃতিকেও খানিকটা পথ ছাড়িয়া দেওয়া চাই।''[13]

বহু পূর্বেই 'টুকরো জমি'-র সমস্যা কবিকে ভাবিয়েছিল। শুধু তাই নয়, 'রাশিয়ার চিঠি'-তে যৌথ কৃষি প্রক্রিয়ার ঢালাও বর্ণনা দিয়েছেন, ''স্বাতন্ত্রিক প্রণালীর চেয়ে ঐকত্রিক প্রণালীতে ঢের ভালো জাতের এবং অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করানো যায়। ... ঐকত্রিকতার মূলনীতি হচ্ছে সমাজবদ্ধ স্বেচ্ছাকৃত যোগ। ... এর সঙ্গে নারী-উন্নতি-প্রচেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে ... এখানে চাষী-মেয়েদের বদল হয়েছে যথেষ্ট। নিজের উপর তাদের অনেক বেশি ভরসা হয়েছে। ... জমিতে বিজ্ঞানসম্মত সার দেবার এবং কলের লাঙল ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়েছে। ... শীতের সময় খেতের কাজের পরিমাণ কমে; তখন চাষীরা বাড়ি-তৈরি রাস্তা-মেরামত প্রভৃতি নানা কাজে শহরে চলে যায়। এই অনুপস্থিতির সময়েও তারা বেতনের এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে।''[14] এদের দেখে কবির বারংবার মনে হয়েছে নিজের দেশের কথা, ''ভারতবর্ষেরই মতো এ দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এইজন্যে কৃষিবিদ্যাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে দিতে না পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায় না। এরা সে কথা ভোলেনি ... যারা বৈজ্ঞানিক, তারা সবাই লেগে গেছে। প্রায় তিন কোটি মণ বাছাই-করা বীজ এদের হাতে জমেছে। ... নূতন শস্যের প্রচলন শুধু এদের কৃষি-কলেজের প্রাঙ্গণে নয়, দ্রুতবেগে সমস্তদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো পরীক্ষাশালা ... রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশেও স্থাপিত হয়েছে।''[15] অথচ ''আমাদের দেশের কৃষক এক দিকে মূঢ়; আর এক দিকে অক্ষম; শিক্ষা এবং শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত।''[16] তাই কবির মনে এই প্রশ্নও জেগেছিল যারা চাষিদের অন্ন থেকে বেতন নেন, পেনশন ভোগ করেন তাঁদের কি দায়িত্ব নেই চাষিদের শিক্ষা দেবার? তিনি কৃষকদের শিক্ষা সম্পর্কে বিদেশি শাসকদের মনোভাব অনুধাবনে সক্ষম হয়েছিলেন, ''চাষাদের শিক্ষাকে এমন শিক্ষা করা চাই, যাহাতে মোটের উপর তাহারা চাষাই থাকিয়া যায়। তাহারা যেন কেবল গ্রামের ম্যাপটাই বোঝে; পৃথিবীর ম্যাপ চুলায় যাক, ভারতবর্ষের ম্যাপটাও তাহাদের বুঝিবার প্রয়োজন নাই। তাছাড়া তাহাদের ভাষা শিক্ষাটা প্রাদেশিক উপভাষার বেড়া ডিঙাইয়া না যায়, সেটাও দেখা দরকার।''[17] পরাধীন দেশে শিক্ষার এই কারুণ্য দূর করতেও যখন তিনি পিছপা হননি তখন স্বাধীন দেশের কর্নধারদের এবিষয়ে আরও উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ বারবার উন্নত কৃষকের কথা যেমন বলেছেন, উন্নত কৃষিপদ্ধতি, বীজের ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন, ‘‘আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে।’’[18] শুধু তাই নয়, কবি যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, প্রকৃত কৃষিবিদ মাত্রেই চেষ্টা করবেন crop rotation এবং বাজারমূল্য আছে এমন শস্য ফলনে জোর দিতে।

বর্তমান পঞ্চায়েত-রাজ ব্যবস্থার সঙ্গে কবির চিন্তা ও পরিকল্পনার সাযুজ্য মেলে। বিকল্প আয়ের উপযোগী করে গড়ে তোলার পক্ষে রায় দিয়েছেন তিনি। যে বহুধাবিভক্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড গ্রামস্তরে শুরু করেছিলেন, আজ তার বড়ই প্রয়োজন। সর্বোপরি কৃষকরা যাতে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সমবায় নীতি প্রণয়ন তাঁর সর্বাপেক্ষা সচেতন ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। একশ বছর পূর্বে জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই নীতি প্রণয়নক রতেে চয়েছিলেনত াে যে দশব্যাপীক ার্যকরহ য়নি,ত াঁরড ৌক্তিতেইস্ পষ্ট, ‘‘কো-অপারেটিভেরে যাগেঅ ন্যে দশেয খনস মাজেরন ীচেরত লায়এ কটাস ৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না।’’[19] এমনকি আজও এই রীতির খুব একটা হেরফের হয়নি। কিন্তু কবি চেয়েছিলেন কেবল ঋণ দিয়ে নয়, একত্রে কাজ করিয়ে কৃষকদের চিত্তের মেলবন্ধন ঘটাতে। তাঁর ঔপনিষদিক চিন্তাধারা এই কাজে প্রেরণা জুগিয়েছিল, আমরা যখন আপনার মধ্যে অন্যকে ও অন্যের মধ্যে আপনাকে পাই তখনই সত্যকে পাই। যেহেতু সমস্ত কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত; ব্যক্তিগত লোভ সেই একের উপলব্ধিতে বাধা আনে। তাই ‘তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ’ সেই একের থেকে যা আসছে তাকেই ভোগ করো। উপরন্তু ‘‘মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে কিন্তু দান করে না।’’[20] তাই শ্রীনিকেতন ছিল জনসাধারণের শক্তিসমবায়ের সাধনা।

বর্তমানে ভারতে জৈব পদ্ধতিতে চাষে আয়ের হার বেড়েছে, কীটনাশক ব্যবহারে দূষিত জমি প্রাকৃতিক উপায়ে চাষে ফলন বাড়াচ্ছে, সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনে মানুষ ক্রমে আগ্রহী হওয়ায় এই পদ্ধতির প্রসার ঘটছে। যে কৃষক কীটনাশক ও সার ক্রয়ে ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন এতে তাঁরাও আশ্বস্ত হচ্ছেন, প্রাথমিক অবস্থায় ভরসা না পেলেও ক্রমে ক্ষুদ্র চাষিদের কাছে জৈবপদ্ধতি প্রিয় হয়ে উঠছে। বিশ্বব্যাঙ্ক প্রদত্ত 2011-এর তথ্য[21] অনুসারে ভারতে আয়ের বৈষম্য অনেক কমেছে, মানবজীবনের মানোন্নয়ন ঘটছে, সর্বভারতীয় দারিদ্র্যের হার কমেছে, অন্যদিকে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে কম শস্য উৎপাদন, খরার কারণে 2012-13 আর্থিক বছরে 152 জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন, গত বছর যে সংখ্যাটা ছিল হাজারের কোটায়, সরকারের

জনকল্যাণমুখীক র্মসূচিরে দৌলতেএ বছরত াহ্রাসে পয়েছে।ত বেএ খনওভ ারতের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ জীবনধারণের জন্য গ্রামীণ জীবিকার উপর নির্ভরশীল। যার মধ্যে কৃষির স্থান সর্বাগ্রে। ''এক পক্ষকে বঞ্চিত করিয়া অন্যপক্ষের ভালো কখনোই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না।''[22] তাই এই উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আমাদের দেশের প্রয়োজন এক উন্নতমানের কৃষিব্যবস্থা যা আজকের আন্তর্জাতিক বাজারে ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। জমি পড়ে নেই, ফসলের দরও বাড়ছে, অথচ চাষির সারা বছর খাবার জোটে না, ঋণে ডুবে থাকেন, কারণ প্রয়োজন বেড়েছে অথচ প্রণালীর পরিবর্তন হয়নি। একই মাটিতে এখনকার প্রয়োজন অনুসারে অধিক ফলনের ব্যবস্থা করে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে, সেচ ব্যবস্থার সংস্কার করে, জলবায়ু পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে তদুপযোগী বীজের ব্যবহার বাড়িয়ে, শস্য সংরক্ষণে ও বিক্রয়ে উন্নত প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো প্রয়োগ করতে পারলে ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর করে খাদ্য সরবরাহে বিশ্বে অন্যতম উৎস হয়ে উঠবে ভারত। আর কর্ষণজীবী সভ্যতার সঙ্গে তা কেবল খাদ্যের সম্পর্ক নয়; মানবিক মূল্যবোধ, গার্হস্থ্য সম্পর্ক এসবই বাহিত হয়ে চলেছে যুগ-যুগান্ত ধরে। আমরা আজ যেন তা বিস্মৃত না হই।

একদিন যিনি ভেবেছিলেন কেবল লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করবেন, এই তাঁর একমাত্র কাজ; তিনিই অতঃপর অনুভব করেন আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে হচ্ছে কৃষিপল্লী আর আজই তার চর্চা শুরু করা চাই। তারপর দুর্গম বন্ধুর পথে সামান্য পাথেয় নিয়ে চলেছে সেই ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ একাধারে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা, নান্দনিক বোধ আর ঔপনিষদিক চিন্তাকে মিলিয়ে দিয়েছেন কৃষিচিন্তার সঙ্গে। অর্থনীতিবিদঅ মর্ত্যে সনে যখানে পশ্চিমীদৃষ্টিকোণে থকেে শ্রেণীগতব ঞ্চনারজ ন্য দায়ী করেছেন প্রশাসনিক অক্ষমতা, সামাজিক অবিচার ও অর্থনৈতিক বঞ্চনাকে, সেখানে কবি মানুষের অন্তর্গত রিপুকেই সব সমস্যার মূল চিহ্নিত করেছেন। কারণ তিনি সর্বদা চেয়েছেন মানুষে-মানুষে সমন্বয়। তাই জোর দিয়েছেন সমবায় নীতি ও পঞ্চায়েত নীতির ওপর। একাধারে কৃষিজমি পরিকল্পনা, শস্য পরিকল্পনা, কৃষিপদ্ধতি পরিকল্পনা, সর্বোপরি কৃষকের সামগ্রিক উন্নয়ন—সবদিক থেকেই ভবিষ্যতদ্রষ্টার ভূমিকা পালন করে গেছেন তিনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল দু-একটি গ্রাম আদর্শরূপে গড়ে তোলা যা সমগ্র ভারতের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে। স্ব-অধিকারে, উন্নত জীবনযাপনে আগ্রহী সেইসব স্বল্প-উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃষি-দর্শন অনুপ্রেরণারূপে কাজ করুক। তিনি চেয়েছিলেন ভবিষ্যৎ তাঁর কাজের মূল্যায়ন করবে। আজ সেই সময় আগত যখন কেবল মূল্যায়ন নয়, তাঁর কাজের যুগোপযোগী প্রয়োগেরও সময় হয়েছে।

উল্লেখসূত্র :

1. The Robbery of the Soil, lecture delivered by L. K. Elmhirst at the Rammohan Library, 28th July 1922. First published in Modern Review, October 1922.
2. L. K. Elmhirst, *Poet and Plowman,* Visva Bharati, Santiniketan, 1976, p-48.
3. রাশিয়ার চিঠি, বার্লিন, 28 সেপ্টেম্বর 1930 রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, 1381.
4. সমবায়নীতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, 1381, পৃ.-453-454.
5. 3নং সূত্র দেখুন।
6. L. K. Elmhirst, Diary, dated 10 February, 1922.
7. সমবায়নীতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, 1381, পৃ.-451.
8. 'রায়তেরক থা'(প্রমথ চৌধুরী,বি শ্বভারতী, 1351)গ্রন্থের. বীন্দ্রনাথ ঠাকুরলি খিত ভূমিকা।
9. তদেব।
10. প্রমথ চৌধুরী, 'রায়তের কথা', বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, বিশ্বভারতী, 1351, পৃ.-19.
11. রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ সদর কাছারির অধীনে 9টি ডিহি কাছারি নিয়ে 3টি বিভাগীয় কাছারি তৈরি করেন। উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। একে বলা হত 'Division system' বা 'মণ্ডলী প্রথা'।
12. World Bank, "India Country Overview 2008".
13. আবরণ, 'শিক্ষা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, 1381, পৃ.-325.
14. রাশিয়ার চিঠি, বার্লিন, 1 অক্টোবর 1930, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, 1381.
15. তদেব।
16. রাশিয়ার চিঠি, বার্লিন, 2 অক্টোবর 1930, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, 1381.
17. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি, 'শিক্ষা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, 1381, পৃ.-516.
18. ভূমিলক্ষ্মী, 'পল্লীপ্রকৃতি', রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, 1381, পৃ.-526.
19. 3নং সূত্র দেখুন।
20. শিক্ষাসমস্যা, 'শিক্ষা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, 1381, পৃ.-297.
21. World Bank, "India Country Overview 2011".
22. সফলতার সদুপায়, 'আত্মশক্তি', রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, 1381, পৃ.-559.

গ্রন্থসূত্র :

1. অধিকারী, শচীন্দ্রনাথ, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, 1380.
2. চিঠিপত্র-5, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, 1352.
3. চৌধুরী, প্রমথ, রায়তের কথা, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পুনর্মুদ্রণ, 1354.
4. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয়, দ্বাদশ, বিংশ, সপ্তবিংশ খণ্ড, কলিকাতা : বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ, 1381.
5. ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ, ''পল্লীর উন্নতি : পিতৃস্মৃতি", রবীন্দ্রায়ণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পুলিনবিহারী সেন, সম্পাদিত, কলকাতা : বাক্‌সাহিত্য, 1414, 42-52.
6. মুখোপাধ্যায়, জীবনকুমার, অন্যান্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা : সাহিত্যশ্রী, 1380.
7. Das, Sisir, Ed. *The English Writings of Rabindranath Tagore,* Vol. 2&3, New Delhi : Sahitya Akademi, 1996.
8. Elmhirst, L. K. *Poet and Plowman,* Santiniketan : Visva Bharati, 1976.
9. Jana, Manindranath, *Education For Life : Tagore And Modern Thinkers,* Calcutta : Firma KLM, 1984.
10. Lal, Prem Chand, *Reconstruction and Education in Rural India,* London : George Allen & Unwin, 1932.
11. Roy, Nityananda, *Tagore's Thought On Rural Reconstruction And Role of Village Development Societies,* Delhi : Abhijeet Publications, 2008.
12. Ramanna, Anitha, *Farmers' Rights in India : A Case Study,* Norway : The Fridtjof Nansen Institute, 2006.
13. Sen, Amartya, *On Economic Inequality,* New Delhi : Oxford University Press, 1999.

যা দেখেছি, যা পেয়েছি
কলকাতায় যাঁদের দেখলাম

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলাম 1947-এ। দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার উৎসব দিল্লিতে দেখেও এসেছি।

প্রথম দিন প্রেসিডেন্সির সব ক্লাসে শিক্ষকরা আমাদের মনে একটা 'অহংবোধ' ঢুকিয়ে দিলেন 'Everybody, who is anybody in Bengal, was a student of Presidency College.' আমাদেরও তাঁদের মতো হতেই হবে। অনেক নামকরা অধ্যাপক তখন প্রেসিডেন্সিতে। সুশোভন সরকারের কাছে পড়বার সুযোগ হয়নি—কারণ আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। পদার্থ বিদ্যায় কুলেশ কর, রসায়নে পি সি রক্ষিত, ইংরেজীতে সোমনাথ মৈত্র, তারাপদ মুখার্জী, বাংলায় জনার্দন চক্রবর্তী, সুবোধ সেনগুপ্ত। এত নামজাদা অধ্যাপকের ভিড়ে গুরু খুঁজে পাইনি।

স্কটিশ চার্চে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

আই এস সি-র পদার্থ বিদ্যায় অনার্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছে হল। তখন স্কটিশচার্চে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর খুব নামডাক। প্রেসিডেন্সি ছেড়ে স্কটিশ চার্চে চলে গেলাম 1949-এ। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর পড়ানোর একটি অভিনব কায়দা ছিল। পাঠ্য বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ জ্ঞান, আমাদের অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বোঝাবার একটি অভিনব ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর ছেলে প্রবীর রায়চৌধুরীও আমাদের সহপাঠী। ডাঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছাত্রজীবন সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত ছিল। কাহিনীটি তাঁর ছেলের কাছে শুনেছি কিনা মনে পড়ছে না। তবে কাহিনীটি সঠিক বলে বিশ্বাস করেছি আমরা সকলে। তিনি ম্যাট্রিকে প্রথম হয়েছিলেন-সবচেয়ে কম নম্বর পেয়েছিলেন বিজ্ঞানে। I.Sc.তে আবার প্রথম হলেন এবার সবচেয়ে কম নম্বর পেলেন পদার্থবিদ্যায়। পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম হলেন সবচেয়ে কম নম্বর পেলেন চুম্বক বিদ্যায়। চুম্বক বিদ্যা স্পেশাল পেপার নিয়ে M.Sc.তে প্রথম বিভাগে প্রথম হলেন। সবচেয়ে কম নম্বর পেলেন থার্মোডায়নামিক্সে। থার্মোডায়নামিক্সে D.Sc. হলেন। কাহিনীটি চমকপ্রদ। পদার্থবিদ্যায় বিভিন্ন শাখায় তাঁর সহজ দখল আমায় বিস্মিত করেছে। অনেক অধ্যাপকই ক্লাশে পড়াবার আগে তৈরি হয়ে আসতেন—ডাঃ রায়চৌধুরীর তৈরী হওয়ার প্রয়োজন হতো না।

যে কোনও প্রশ্নের উত্তর তাঁর তৈরী। আমার জীবনে তাঁর চেয়ে ভাল অধ্যাপক পাই নি। সে যুগে I.Sc. তে ক্যালকুলাস পড়নো হত না। B.Sc.তে ক্যালকুলাস পড়ানো শুরু হত। অথচ পদার্থ বিদ্যায় অনার্স স্ট্যান্ডার্ডে ক্যালকুলাসের মাধ্যমেই পাঠের সূত্রপাত। এজন্য ডাঃ রায়চৌধুরী প্রথমেই আমাদের ক্যালকুলাসের প্রথম পাঠ দিয়ে দিলেন। তখন ক্যালকুলাসের পাঠ্য বইয়ের লেখক বি. সি. দাস এবং বি. এন. মুখার্জী। বি. সি. দাসের কাছে প্রেসিডেন্সিতে পড়েছি। বি. এন. মুখার্জী পড়িয়েছেন স্কটিশে। দুজনের পড়ানোর ঢং একদম আলাদা।

ডাঃ রায়চৌধুরী আমাদের ক্যালকুলাস পাঠের জন্য দুটি চটি বই কিনতে বললেন। একটি বইয়ের নাম Calculus Made Easy লেখক Thompson অন্য বইটির লেখক Hunter. Thompson এর বইয়ের Preface, Dr. Roychowdhury প্রথমেই পড়ে শোনালেন। Preface টি আনুপূর্বিক বলতে পারব না—তবে মূল কথা আজও ভুলি নি। কারণ Preface টি চিত্তাকর্ষক।

যতটুকু মনে পড়ছে, বলছি, 'Mathematicians are great fools in order to hide their foolishness they deliberately make simple things difficult' তারপর নিজেকে দেখিয়ে বললেন, what one fool can understand এবার আমাদের দেখিয়ে বললেন other fools can ক্লাসে হাসির ফোয়ারা ছুটল। এই বই দুটিতে ক্যালকুলাসের লিমিট এবং কন্টিনিউটি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দিয়েই Differentiation ও Integration এ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই যে ক্যালকুলাসের মেড ইজি পড়েছিলাম, অঙ্কের পাশকোর্সে দাশ মুখার্জীর বই সরল মনে হয়েছে। ওই বই পড়ার প্রয়োজনও কম হয়েছে। ডাঃ রায়চৌধুরী ক্লাসে পড়িয়েছিলেন Heat and Thermo dynamics এই বিষয়ে আজও বোধহয় তাঁর পড়ানো ভুলি নি—যদিও 62 বছর কেটে গেছে এবং সারা জীবন পদার্থ বিদ্যার চর্চা করার অবকাশ হয় নি। টেস্ট পরীক্ষার পর সপ্তাহে 5 দিন 11টা থেকে 6টা পর্যন্ত প্রায় একটানা পড়াতেন। এই পড়ানো কলেজের রুটিনের বাইরে। মাঝে একবার চা, জলখাবার খাওয়ার জন্য আধঘন্টা ছুটি মিলত। পড়াতে পড়াতে তিনি কাঁচের গ্লাসে, গ্লাসের পর গ্লাস চা খেতেন—সিগারেটও চলত। আমাদেরও ক্লাসে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি ছিল—যদিও আমরা কেউ-ই তাঁর সামনে সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবতেও পারিনি। ঘন্টার পর ঘন্টা পড়িয়েই চলেছেন। তিনিও ক্লান্ত নন—আমরাও অবাক বিস্ময়ে শুনছি। একের পর এক বিজ্ঞানের ছবি এঁকে চলেছেন আমাদের মনে। আমরা সত্যিই অভিভূত।

1951-তে B.Sc. (Hons) এর পর আমরা বিজ্ঞান কলেজে চলে গেলাম। Dr. Roychowdhury ও কিছুদিন বাদে স্কটিশ চার্চ কলেজ ছাড়লেন। ক্রিশ্চান না হওয়ার অপরাধে তাঁর বেতন 500 টাকা আর ক্রিশ্চান অধ্যাপকেরা পেতেন 800 টাকা।

ইতিমধ্যে Board of Secondary Education গঠিত হয়েছে। বোধ করি কম বেতনের ক্ষোভে তিনি Board of Secondary Education এর ডেপুটি সেক্রেটারীও হলেন। কিছুদিন বাদে সেক্রেটারীও হয়েছিলেন। ততোদিনে আমি চাকরি সূত্রে নানা জেলায়

প্রশাসন চালাচ্ছি। কোনও কোনও জেলায় ডাঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাত এবং আলোচনাও হয়েছে। এটুকু বলতে পারি ডাঃ রায়চৌধুরী অধ্যাপক হিসেবে যেমন বিস্ময়কর সফল, প্রশাসনের কাজে অতটা নন। পরে তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক হয়েছিলেন সেটাই তাঁর আসল জায়গা। কল্যাণীতে আমার এক ছোট ভাইয়ের স্ত্রী তাঁর ছাত্রী হয়েছিলেন। কল্যাণী স্পিনিং মিল পরিদর্শনে গিয়ে আমার ভ্রাতৃবধূর সহায়তায় ডাঃ রায়চৌধুরীর বাড়ি গিয়েছি। আমার সঙ্গে স্ত্রী পুত্র কন্যা। তাঁদের এই বিস্ময়কর অধ্যাপককে দেখিয়েছিলাম। তিনি তখন ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। দিনে একবার ওঠেন বিকেল বেলায়। ঘটনাচক্রে তাঁর ছেলে এবং আমার বন্ধু প্রবীরও সেদিন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা হল। অধ্যাপকের সঙ্গে বাক্যালাপের সুযোগ পেলাম না।

আমার দেখা এই শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক নিঃসন্দেহে আমার গুরু।

সত্যেন বোস ও মেঘনাদ সাহা

বিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পর রাজাবাজারে বিজ্ঞান কলেজে ঠাঁই মিলল (1951)। এ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে সেই বছর থেকে তিন বছরের M.Sc. (Tech) কোর্স শুরু হয়েছে। মোটামুটি ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স—কিন্তু একটু উঁচু পর্যায়ে। তখন পর্যন্ত মনে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার বাসনা। বিধাতাদেব হয়তো বা একটু মুচকি হেসেছিলেন।

তখন বিজ্ঞান কলেজের স্বর্ণযুগের পালা শেষ হয় নি। সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, ডাঃ এস কে মিশ্র, রসায়নে পি. বি. সরকার, বীরেশ গুহ—অনেক খ্যাতনামা অধ্যাপকদের ভিড়। তখন রেডিও ফিজিক্স বিভাগ গড়ে তুলেছেন ডাঃ এস কে মিশ্র। ইন্স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স গড়ে তুলছেন মেঘনাদ সাহা। এখন প্রতিষ্ঠানটির মূল কেন্দ্র সল্টলেকে। রাজাবাজারে একটি শাখা আছে। আমাদের বিভাগের অধ্যাপক পি. সি. মহান্তি। রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে আমরা সব মিলে 300 ছাত্র। সব বিভাগের অধ্যাপকদের দেখা মিলত প্রায় রোজই। অন্য বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিতি ছিল। সত্যেন বোস পদার্থবিদ্যা পড়াতেন বাংলায়। আজ সেকথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইতেন না। ইংরেজী, বাংলা ও বিজ্ঞান তিন বিষয়েই তাঁর অসামান্য দখলের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। কখনও কখনও নিজের ক্লাস পালিয়ে সত্যেন বোসের ক্লাস করেছি। পড়াবার সময় তিনি কোনও ফরমুলার সাহায্য নিতেন না। পদার্থবিদ্যার মূল তত্ত্ব থেকে নিজস্ব ধ্যানধারণার সাহায্যে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক সূত্র বেরিয়ে আসত। পাঠ্যবিষয়ে ছাত্রদের মনে পরিষ্কার ছবি ফুটিয়ে তুলতে জানতেন। এটি একটি বিরল প্রতিভা। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে দেখিনি। কিন্তু তাঁর ছাত্র বাৎসল্য প্রত্যক্ষ করেছি সত্যেন বোসের মধ্যে। তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতেন গবেষণার যন্ত্রপাতি তৈরী করে নিতে। তিনি কেবলই তাত্ত্বিক গবেষণায় থেমে থাকেন নি। অনেক যন্ত্রের নকসা নিজেরহ াতেৈ তরীক রেয ন্ত্রটিব ানিয়েনি তেন।তাঁরঅ ন্যতমপ্রিয়ছ াত্রশ ্যামাদাস চ্যাটার্জীর কাছে প্রেসিডেন্সিতে পড়ে এসেছি। ভূমিকম্পের আগমন বার্তা জানতে পারলে বহু মানুষ সতর্ক হওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। সত্যেন বোস শ্যামাদাস চ্যাটার্জীকে

নির্দেশ দেন গবেষণা করে দেখতে, ভূমিকম্পের কয়েকদিন আগে থেকেই উষ্ণ প্রস্রবনের জলে হিলিয়াম গ্যাসের পরিমাণ বাড়ে কিনা। শ্যামাদাস চ্যাটার্জী অনেক পরে পরীক্ষা করে দেখলেন সত্যেন বোসের অনুমান সঠিক। এ বিষয়ে শ্যামাদাস চ্যাটার্জীর গবেষণা কাগজে বেরিয়েছিল। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস জানাবার এটি একটি নির্দেশিকা হতেই পারে। জানি না এই গবেষণার আজকের অগ্রগতি কতটা হয়েছে। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে এই গবেষণা সত্যেন বোসের বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টির ফসল।

সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা জাগিয়ে তুলতে সত্যেন বোস চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। 1948-এ তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপরই শুরু হল 'জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকা।

সত্যেন বোসের জগৎজোড়া খ্যাতি বোস-আইনস্টাইন থিওরী থেকে—'বোসন' সংখ্যায়নের কথা কে না জানেন? আমরা যখন ছাত্র তখন সত্যেন বোস অনুসন্ধান করছেন—মানুষ রঙ দেখে কি করে? পদার্থবিদরা মনে করতেন চোখের তিনটি নার্ভের কমবেশী স্পন্দনে 7টি রঙ দেখা যায়। কিন্তু দেহবিজ্ঞানীরা চোখে এ ধরণের নার্ভের অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। এই সমস্যা নিয়ে সত্যেন বোসের কাজের কথা বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রাবস্থায় শুনেছি—সমাধান হয়েছে কি হয়নি জানা নেই।

আইনস্টাইনের ইউনিফাইড কিন্তু থিওরী তিনি প্রমাণ করে যেতে পারেন নি। তাঁর মত বিরাট মানুষের অনুমানের ভিত্তিতেই থিওরীটির অস্তিত্ব। এটি প্রমাণ করতে হলে অনেকগুলি সূত্র প্রমাণ করা প্রয়োজন। আমাদের ছাত্রাবস্থায় সত্যেন বোস এইসব সূত্র প্রমাণে সচেষ্ট। বেশ কয়েকটি সূত্রের প্রমাণ তিনি বের করেছিলেন—কয়েকটি বাকি ছিল। আজকের সঠিক পরিস্থিতি জানা নেই। তবে ইউনিফায়েড কিন্তু থিওরী আজও প্রমাণিত সত্য নয়।

মেঘনাদ সাহার সান্নিধ্যে এসেছি 1952-তে। তখন তিনি ভারতবর্ষের নবগঠিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম নির্বাচনের প্রার্থী। আমি তাঁর ছাত্র ও পোলিং এজেন্ট। কলকাতার উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বাম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী মেঘনাদ সাহা। নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হলেন মেঘনাদ সাহা। ফলাফল বেরোবার পর সোৎসাহে আমরা ছাত্রের দল তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার আশায় বিজ্ঞানকলেজের গেটে মালা হাতে প্রতীক্ষারত। যথাসময়ে তিনি এলেন আমাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না। সোজা বিজ্ঞান কলেজের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের স্মৃতি বিজড়িত ঘরে—একটি ছোট্ট ঘর—সযত্নে সাজানো। পিছনে আমরাও চললাম/ঘরে পৌঁছেই মেঘনাদ সাহা আচার্য্য রায়ের ছবির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন প্রায় 10 মিনিট ধরে। তারপর উঠে আমাদের মালা গ্রহণ করলেন এবং সংবর্ধনা সভায় নির্বাচনের কর্মীদের ধন্যবাদ জানালেন। তাঁর গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার প্রমাণ পেলাম।

মেঘনাদ সাহা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তখন তিনি প্রথমে থাকতেন হিন্দু হোস্টেলে। জাতের বিচারে সকলের সঙ্গে খাওয়ার অধিকার তাঁর নাকি ছিল না। স্বাধীনতার আগে বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

তিনি যখন পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেলেন ততদিনে পদার্থবিদ্যায় এক বিপ্লব ঘটে গেছে। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টামতত্ত্ব নীলস বোরের বর্ণালী তত্ত্ব, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার ধ্যান ধারণায় আমূল পরিবর্তন এনেছে।

মেঘনাদ সাহা মূলতঃ পরীক্ষামূলক গবেষণায় বেশি জোর দিয়েছিলেন। আলোর চাপের উপর গবেষণার জন্য 1918-তে D.Sc. হলেন। 1920-তে থার্মাল আয়োনাইজেশনের উপর গবেষণা তাঁকে বিপুল প্রতিষ্ঠা এনে দিল। বিশাল নক্ষত্র ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে গভীর সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে তাপ আয়োনাইজেশন তত্ত্বে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রপাত তাঁর তত্ত্বকে ভিত্তি করেই।

মেঘনাদ সাহা এলাহাবাদে একটি পদার্থবিদ্যার গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলেন (School of Physics)

1935 থেকে তিনি Science and Culture নামে মাসিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকার প্রকাশনের কাজ শুরু করেন। 1939-এ তিনি কলকাতার পালিত অধ্যাপক হলেন। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম কলকাতায় সাইক্লোট্রোন মেশিন (গতিবর্ধক যন্ত্র) প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে মহাজাগতিক রশ্মির বিষয়ে গবেষণায় তিনিই অগ্রণী।

কলকাতার বিজ্ঞান কলেজের চৌহদ্দির মধ্যে তিনি Institute of Nuclear Physics গড়ে তোলেন। সেখানে তাঁকে কাজ করতে আমরা দেখেছি চরম নিষ্ঠার সঙ্গে। আজ এই প্রতিষ্ঠান অনেক বড় হয়েছে। রাজাবাজারে তার স্থান সংকুলান হয়নি। সল্টলেকে মূল প্রতিষ্ঠানটি উঠে গেছে, রাজাবাজার শাখাটি আজও আছে। এখন প্রতিষ্ঠানটির নাম Saha Institute of Neuclear Physics, 1950-এ Institute of Nuclear Physics এর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন জোলিও কুরী ও মাদাম কুরী। আমারা তখন ছাত্র। প্রতিষ্ঠানটি আমাদের গর্বের বস্তু। মেঘনাদ সাহার কাছে পড়ার সুযোগ পাই নি কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার জীবনের মস্ত বড় প্রাপ্তি।

কর্মজীবনে কি পেলাম ?

বিজ্ঞান কলেজে পাঠরত অবস্থায় হঠাৎ আমি অনাথ হলাম। আমার বাবা হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ-ই চলে গেলেন। 21 বছর বয়সে আমার মাথার উপর এসে পড়ল সংসারের দায়-দায়িত্ব। দাদামশাই ক্ষিতিমোহন সাগ্রহে আর্থিক সাহায্য দিতে চাইলেন, অল্প কিছুদিনের জন্য সে সাহায্য নিতেও হল—কিন্তু মন মানল না। আমি তো সাবালক ও স্নাতক। অন্যের অনুগ্রহে থাকবো কেন? দাদামশাইয়ের সাহায্য নিশ্চয় অনুগ্রহ নয়। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বোঝা হয়ে থাকব কেন? আমার কর্মজীবনে ইতিবৃত্ত বলতে বসব না। এই বিষয়ে 'The Zoo I loved' নামে একটি বই প্রকাশ করেছিলাম ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে।

আজ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি। ছাত্রজীবন সুচারুভাবে শেষ করতে না পারার জন্য কোনও খেদ আমার নেই। যা পেয়েছি যথেষ্ট পেয়েছি। প্রশাসকের ভূমিকায়

মানুষের কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছিলাম। প্রশাসকের ক্ষমতা সমাজের দুর্বলতর মানুষদের কাজে ব্যবহার করতে পেরেছি। এই সুযোগ আমি আর কোনও কাজে পেতাম বলে মনে হয় না। সমাজের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা আমার সাধ্যমতো পালন করতে পারার সুযোগ কজন মানুষের জীবনে আসে?

'প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে' মাঝেমাঝেই বিরোধ বেধেছে। সেই যুদ্ধে সবসময় জয়ী হইনি, কিন্তু পরাজয়ও মেনে নিই নি। সেটাই আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি। এই বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছি, আজকের আলোচনা এমন কয়েকজন মানুষ সম্বন্ধে যাঁরা আমার মনে দাগ কেটে গেছেন— পরে আরও দুয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করব যা পাঠকদের কৌতূহলী করতে পারে এবং কিছু নতুন বার্তা পাঠকেরা পেতে পারেন।

সমতটের বই শুধু দেখার নয়, পড়ার, যুক্তিতে শাণ দেবার বই

1. **সমতট শতক : প্রবন্ধ**/সমতটের প্রথম শত সংখ্যা থেকে নির্বাচিত —150 টাকা।
2. **সমতট শতক : গল্প**/সমতটের প্রথম শত সংখ্যা থেকে নির্বাচিত —150 টাকা।
3. **সমাজ-মন ও নারী-ভাষ্য**/মানসী দাশগুপ্ত —100 টাকা।
4. **নবসংস্করণে বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা**/বাংলা গদ্যজিজ্ঞাসা বইটি আদ্যন্ত পরিমর্জিত এবং সংশোধিত হয়ে একটি নতুন বই—150 টাকা।
5. **বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারা**/নীহারবিন্দু সেন—60 টাকা।
6. **রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা**/দেবশরণ দাশগুপ্ত—40 টাকা।
7. **সাবর্ণ কলিকাতা (কলকাতার ইতিহাস)** (2 সং)/সাধন দাশগুপ্ত—20 টাকা।
8. **পাকিস্তানের গোড়ার দিনগুলি**/নির্মল সেনগুপ্ত—15 টাকা।
9. **অম্লান দত্ত : ব্যক্তিত্ব ও সমাজ ভাবনা**/সম্পাদনা পথিক বসু—100 টাকা।
10. **মুক্তি তোরে পেতেই হবে**/অম্লান দত্ত—35 টাকা।
11. **নরেশ গুহ-কে অম্লান দত্তের খানকয় চিঠি**—21 টাকা।
12. ***বাঙালি বুদ্ধিজীবীর আত্মজিজ্ঞাসা*** *(তৃতীয় সং)*—40 টাকা।
13. **মানুষ** (তৃতীয় সং)—40 টাকা।
14. **মির্জা গালিব**/সাধন দাশগুপ্ত (দ্বিতীয় সং)—60 টাকা।
15. ***প্রসঙ্গ :*** **রবীন্দ্র সংগীত**/সাধন দাশগুপ্ত (দ্বিতীয় সং)—30 টাকা।
16. ***মানবপুত্র যীশু***/সাধন দাশগুপ্ত—30 টাকা।
17. ***মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য***/সম্পাদনা : সাধন দাশগুপ্ত—100 টাকা।

এরপর 615 পৃষ্ঠায়

ছেলের মতো

কালাচাঁদ ঘোষ

তমালঅ ারঅ নন্যাকেহ াইে রাডেন ামিয়েদ ূরপাল্লারস রকারিব াসটাহু স্ক রে বেরিয়ে যায়। বাসের গমন পথে তাকিয়ে গরমে বিধ্বস্ত অনন্যা রুমালে ঘাড় গলার ঘাম মুছতে গিয়ে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'তোমাকে পইপই করে বলেছিলাম বাসে নয় নিজেদের গাড়ি নিয়ে চল। শুনলে আমার কথা! না, তেলের যা দাম।' অনন্যা ভেংচি কাটে।

তমাল আশেপাশে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, তাদের কথা শোনার মতো এই গনগনে রোদে দাঁড়িয়ে নেই। গাড়ি না আনার যুক্তি হিসেবে বলে, 'তা কেন, আসলে হাই রোডে প্রাইভেট চালানোটাই রিস্কি। তাছাড়া আমাদের বাড়ির দোড়গোড়া পর্যন্ত তো গাড়ি যাবে না। তাহলে আর গাড়ি এনে লাভ কি?'

পাল্টা যুক্তিতে অনন্যা বলে, 'ঠিক আছে, তাই না হয় হল। কিন্তু সকাল সকাল বেরোলে তো কলকাতা থেকে সাড়ে তিন ঘন্টার রাস্তা বেগুনপোড়া হয়ে আসতে হত না। আসলে তোমার লোভটাই বেশি। যত রোগী ততো পয়সা। এইজন্য সকালের চেম্বারটা পর্যন্ত ছাড়লে না। তুমি যে কোন ধাতুতে তৈরি আমার জানতে বাকি নেই।'

গরমই যে অনন্যার একমাত্র উষ্মার কারণ তা নয়। আজ তমালের বাবার কাজ। বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনেও সে একবারের জন্যও গ্রামের বাড়িতে আসেনি। আজকেও আসতে চায়নি। কিন্তু পারিবারিক দায়বদ্ধতার কথা ভেবে অনন্যা তাকে এরকম জোর করেই নিয়ে এসেছে। তাছাড়া সে বাড়ির বড়ো বউ। ছেলের দোষ কেউ দেখবে না, তমালের না আসার কারণ হিসেবে তাকেই দায়ি করবে।

দীর্ঘদিন হস্টেলে থেকে লেখাপড়া শেখা তমালকে বাবার মৃত্যু তেমনভাবে নাড়া দেয়নি। সে এক অন্য মানসিকতার মানুষ। শ্রাদ্ধশান্তি, পারলৌকিক ক্রিয়া ইত্যাদিতে আস্থা নেই। এমনকি বাবার মৃত্যুতে শ্বেতবস্ত্র পরিধান কিংবা ধরাও গলায় নেয়নি। সে বলে, 'আমি ধরা নিলাম কি নিলাম না তাতে কিছু আসে যায় না। শ্যামল তো নিয়েছে। পরিবারের একজন নিলেই হল। তাছাড়া শোক প্রকাশের নামে সঙ সাজার ইচ্ছে আমার নেই।"

অনন্যা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে সুযোগ হয় না। একটি অটো এসে স্ট্যান্ডে দাঁড়াতেই তমাল অনন্যার হাত টেনে হুড়মুড় করে উঠে পড়ে। নিশ্চিন্তি, দশ মিনিটে অজয়ের পাড়ে।

গঙ্গা ছাড়া অনন্যা কখনো নদী দেখেনি। কলকাতায় জন্ম, কলকাতাতেই বেড়ে ওঠা। সেজন্য গঙ্গার সঙ্গে অজয়ের ফারাকটা বেশি করে চোখে পড়ে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে যখন পাহাড়ি নদীগুলো জলাভাবে ধুঁকতে থাকে, জোয়ার-ভাঁটা সমুদ্রের জলে গঙ্গা তখনও থাকে ভরভরন্ত। কিন্তু অজয়ের একমুখিনতা এবং চৈত্রের খরতাপে প্রায় শুকিয়ে আসা গোড়ালি ডোবা জল পেরিয়ে ওঠা অনন্যার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। তিরিশ পেরনো অনন্যা নদীর জলে পা দিতেই যেন কোনো এক মন্ত্রবলে আঠারোতে নেমে আসে। উচ্ছল কিশোরী-পায়ে জল ছেটাতে ছেটাতে নদী পেরোল।

তমাল পাড়ে উঠে হতাশ। এই অজ পাড়াগাঁয়ে একমাত্র পরিবহন যে দু-চারটে রিকশা থাকার কথা এই মুহূর্তে তাদের একটাও চোখে পড়ে না। সে ঘড়ি দেখে। ঘড়ির দুটি কাঁটা জড়াজড়ি করে রয়েছে। ঘাট থেকে বাড়ি দেড় কিলোমিটার। একা হলে তমাল তোয়াক্কা করত না। হেঁটে চলে যেত। কিন্তু সঙ্গে যে অনন্যা।

তমাল আবারও সন্ধানী দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায় না। এই ভরদুপুরে সওয়ারি ধরার আশায় কোনো রিকশাওয়ালা বসে নেই। রাস্তায় তারা দুজন ছাড়া মানুষ তো ছাড়, চৈত্রের কাঠফাটা রোদে একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। বিপদ বুঝে তমাল ঢোঁক গেলে।

সামনে বটগাছ। ছায়ার আশায় কাছে যেতেই তমালের চোখ চকচক করে ওঠে। একটা রিকশা। বটের ছায়ায় রিকশা রেখে চালক সিটে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তমাল ডেকে তোলে, 'এই রিকশা যাবে?'

আচমকা ঘুম ভেঙে তমালকে সামনে দেখে রিকশাওয়ালা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও তারপরেই অস্বাভাবিক নির্লিপ্ততায় বলে, 'কোথায় যেতে হবে?'

- চন্ডীপুর।

- যেতে পারি। ভাড়া বিশ টাকা, আর এতটা পথ ঠ্যাঙানোর জন্য খুশি করে দিতে হবে।

- মানে। তমাল খিঁচিয়ে ওঠে। 'এমনিতেই ভাড়া বেশি চাইছ। আবার বখশিস। পয়সা খোলামখুচি না রাস্তায় গড়াগড়ি যায়। পনের টাকা দেব, চল।'

রিকশাওয়ালা কাঁধের গামছা ফেট্টি দিয়ে মাথায় বাঁধে। ভাঙাচোরা মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ির ভাঁজে হেসে বলে, 'হেঁটে চলে যান না, একটা পয়সাও খরচ হবে না।'

রিকশাওয়ালার উত্তরে যে কোনো মানুষেরই রেগে ওঠার কথা। তমাল সে পথের ধার দিয়েও হাঁটে না। নির্বিকার বলে, 'তাই যাব।'

অনন্যা এগিয়ে আসে। তমালের অভব্যতা এতক্ষণ নীরবে হজম করছিল। আর পারে না। তার খুব বলতে ইচ্ছে করে, 'রাতবিরেতে রোগীর বাড়ি থেকে ডাকতে এলে দুশো টাকার ভিজিট এক লাফে চারশ, সঙ্গে যাতায়াতের রিকশা কিম্বা ট্যাক্সি ভাড়া। গরিব হলেও ইতর বিশেষ হয় না। তার বেলা?' কিন্তু বলে না। হয়তো রিকশাওয়ালার সামনে বলতে রুচিতে বাধে। শুধু বলে, 'আপনি চলুন দাদা, যা নেবেন নেবেন।'

রিকশাওয়ালা বিগলিত, 'আপনি খুব ভালোমানুষ গো বউদিমণি।' সিটের ধূলো ঝেড়ে ওদের বসার জায়গা করে দেয়।

এবড়োখেবড়ো মাটির রাস্তায় গোত্তা খেতে খেতে রিকশা চলে ধীর গতিতে। যত না চলে ধুলো ওড়ে তার বেশি। চালাতে গিয়ে রিকশাওয়ালাকে প্রচণ্ড বেগ পেতে হয়। প্যাডেল ঘোরাতে তার পায়ের সবল পেশি ফুলে ওঠে। রোদেপোড়া তামাটে পিঠ বেয়ে ঘাম নামে নদী হয়ে।

অনন্যা তাকাতে তাকাতে যায়। রাস্তার দুপাশে ফুটিফাটা চাষের জমি বুক চিতিয়ে পড়ে রয়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায় রোদের ঝাঁঝে ধুধু করে মাঠ। মাঝে মধ্যে বাতাস বাহিত লু এসে ঝাপটা মারে চোখেমুখে। রিকশাওয়ালা গামছায় নিজের মুখ ডেকে সতর্ক করে অনন্যাকে। 'বউদিমণি গো, আঁচল দিয়ে মুখটা ভালো করে ঢেকে নেন, নইলে গরম বাতাস মুখ পুড়িয়ে দেবে।'

গরিব বলেই হোক, কিংবা তার ব্যবহারে রিকশাওয়ালাকে ভালো লেগে যায় অনন্যার। উপরন্তু বউদিমণির মুখে হলকা লাগলে ক্ষতি হতে পারে ভেবে তার উদ্বেগ অনন্যাকে তার প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। অনন্যা বলে, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

- আমিও চণ্ডীপুরে থাকি।

- ও, তাই নাকি, তবে তো নিশ্চয়ই আপনি আমার শ্বশুরমশাইকে চিনবেন। হারাধন সরকার।

- চিনব না কেন। খুব চিনি। তিনি তো আমাদের কত্তাবাবা ছিলেন। তেনাকে চিনি, কত্তামাকে চিনি, কত্তামার বড়ো বেটাকে চিনি।

কথাটা কানে যেতে তমাল আড়চোখে রিকশাওয়ালার মুখ দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু পেছন থেকে দেখা যায় না। তার ওপর গামছায় ঢাকা। সে মনে মনে বিরক্ত হয় অনন্যার আদিখ্যেতায়।

- ও মা তাই নাকি। আপনি বোধহয় ওদের কাছাকাছি থাকেন।

- এপাড়া ওপাড়া। কত্তাবাবা বড়ো ভালো মানুষ ছিলেন গো বউদিমণি। মানুষের বড়ো উপকার করতেন। কত্তামাও ভালো মানুষ। তিনি তো সর্বদা আমার তালাশ করেন। 'কিরে বদ্রী কেমন আছিস, অনেকদিন এদিক পানে আসিস না, ছেলেপুলে কেমন আছে, বউমাকে নিয়ে আসবি, কোনো দরকার হলে বলবি, সংকোচ করবি না আরো কতকি।

বদ্রীর বলার ধরনে অনন্যা হেসে ফেলে। বলে, 'কত্তামা আপনাকে খুব ভালোবাসে বলুন!'

- একদম নিজের ব্যাটার মতো। সত্যি বলতে কি বউদিমণি এমন মানুষ আর হয় না। যেমন কত্তামা তেমন কত্তাবাবা। কিন্তু ভগবানের সহ্য হল না। মানুষটাকে সাতদিনের জ্বরে কাছে টেনে নিলেন। বদ্রী বড়ো করে শ্বাস ফেলে।

অনন্যা লক্ষ্য করে বদ্রী এত কথা বললেও তমাল আগ্রহ দেখায় না। সে আশ্চর্যরকম চুপ করে আছে। অনন্যা তমালের কোমরে খোঁচায়, 'চেনো নাকি!'

তমাল বিব্রত। কি বলবে ভেবে পায় না। না বললেও খারাপ দেখায় বলে, 'আমি কি করে চিনব। অনেক দিন তো গ্রাম ছেড়েছি। সবাইকে কি মনে আছে?'

তমাল চিনতে পারল না নয়, চিনতে চাইল না। প্রাইমারি সঙ্গী বদ্রীর সঙ্গে কোনদিনই এঁটে উঠতে পারেনি। একটা আদিবাসী হাভাতে ঘরের ছেলে সবদিক দিয়েই তাকে টেক্কা দিয়ে গেছে। কি লেখাপড়া, কি খেলাধূলায়। বদ্রীর আরো একটা সহজাত গুণ ছিল, ছবি আঁকতে পারত। টিফিন পিরিয়ডে ক্লাসে বসিয়ে কতবার তমালের ছবি এঁকেছে। বদ্রী তমালকে বন্ধু বলে ভাবলেও, এই বয়সেই তমাল বড়োলোকের ছেলে বলে বদ্রীকে পাত্তা দিত না। এখন সে নামকরা ডাক্তার। এখন তো আরোই নয়।

হয় আজ বদ্রীকে কথায় পেয়েছে নয়তো বাল্যবন্ধুকে পেয়ে সব কথা হড়হড়িয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে তমালের উন্নাসিকতাকে আমল না দিয়ে এবার সরাসরি বলে, 'তোর মনে আছে গলু, একবার বন্ধুরা মিলে অজয়ে চান করতে গিয়ে তলিয়ে যাচ্ছিলি। সাঁতার জানতিস না আগে বলিসনি। বাহাদুরি দেখিয়ে অনেকটাই চলে গিয়েছিলি, শেষে হাবুডুবু। আমি সাঁতরে গিয়ে তোর চুলের মুঠি ধরে ডাঙায় টেনে আনি। ভাগ্যিস ছিলাম, নইলে সেদিনই অক্কা পেয়ে যেতিস।'

বদ্রী খানিকটা হেসে ফের শুরু করে, 'তোর মনে আছে আর এক দিনের ঘটনা। পাখির বাচ্চা পাড়তে গাছে উঠে সাপের তাড়ায় মগডাল থেকে লাফাতে গিয়ে পা ভাঙলি। ঝাড়া একমাস ঘরবন্দি। কি সব দিন গেছে নারে!' বদ্রী আবার হাসে।

বদ্রী যত হাসে, তমাল ততোই জ্বলে। সে নিজেকে একটা কঠিন আবরণের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। তার মনে হয় বাড়ির পথটা যেন খুব দীর্ঘ।

- গলু তোর মনে আছে ডাংগুলি খেলার কথা। কি বলব বউদিমণি, গলুটা চিরকালের ভ্যাবলা। আমি সাঁ করে ডাং চালিয়েছি, তুই সরে যা। তা না উনি ধরতে এলেন। আর ফসকে গিয়ে গুলি লাগল কপালে। রক্তারক্তি কাণ্ড। চারটে সেলাই পড়েছিল। এরজন্য বাপ আমাকে খুব ঠেঙিয়েছিল। সেই যে ডাং ছেড়েছি আর জীবনে ধরিনি।

অজান্তে তমালের হাত উঠে আসে কপালে। এত বছরেও দাগ একেবারে মিলিয়ে যায়নি। ভুলেই গেছিল, কিন্তু বদ্রী যেন আজ সেই ঘা-টাকে আবার নতুন করে খুঁচিয়ে দিল। যতক্ষণ রিকশায় রইল ততক্ষণ সেই টনটনানি অনুভব করল।

কথায় কথায় রিকশা এসে দাঁড়ায় বাড়ির দরজায়। বদ্রী বলে, 'আছিস তো কদিন। একদিন আসব, তোর সাথে দরকার আছে।

রিকশা থেকে নেমে তমাল সেই যে দোতলায় সেঁধিয়েছে সারা দিন আর অনন্যার দেখা পায়নি। এসে অবধি বাড়ির কাজে ডুবে ছিল। দেখা হল রাতে শুতে যাবার আগে। অবশ্য তমালও নীচে নামেনি। সাবিত্রী দেবী ইচ্ছে করেই ছেলেকে ওপরের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজের বাড়ি আত্মীয়-স্বজনে ভর্তি। তমালকে গুরুদশা অবস্থায় না দেখে নানা জনে নানা মন্তব্য করবে ভেবে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পাঁচজনের কথা পরে। সাবিত্রী দেবী নিজেই কি ছেলের ব্যবহার মন থেকে মেনে নিতে পেরেছেন। কিন্তু ছেলে যখন চায় না তখন না মেনে উপায় কি। কাউকে দিয়ে জোর করে তো কিছু করানো যায় না। একবার মনে হয়েছিল বাপের কাজই যখন করল না, তখন এ সময়ে না এলেই পারত। প্রশ্ন উঠলে বলতে পারতেন, 'ও কলকাতাতেই বাবার কাজ করে নিয়েছে।'

দুপুরে যখন রিকশা থেকে ছেলে আর ছেলের বউ নেমেছিল তমালকে দেখে সাবিত্রী দেবীর স্বামী শোক নতুন করে উথলে উঠলেও, শুধুমাত্র আঁচলটা বারেকের তরে চোখে তুলে অত্যন্ত দৃঢ়তায় নিজেকে সামলে নিয়েছেন। তারপর দীর্ঘ সময় দেখা হয়নি।

রাতে স্বামী-স্ত্রীতে শ্রাদ্ধ নিয়ে কথা বলার সময় বদ্রীর প্রসঙ্গও এসে পড়ে। অনন্যা হাসতে হাসতে বলে, 'সত্যি মানুষটা না খুব মজার। আমাকে একদিনেই কেমন আপন করে নিয়েছে।'

তমালের মুখ গম্ভীর। বদ্রীর প্রসঙ্গে মনে মনে বিরক্ত। কিন্তু অনন্যাকে বুঝতে না দিয়ে বলে, 'তুমি কতটুকু চেনো এই ছোটোলোকগুলোকে। ওরা এই রকমই। সুঁচ হয়ে ঢোকে ফাল হয়ে বেরোয়। যে কদিন এখানে আছো ওর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবে। একদম বিশ্বাস করবে না ওর কথা। ও পারে না এমন কাজ নেই।'

যে উৎসাহে অনন্যা বদ্রীর কথা তুলেছিল তমালের ব্যবহারে তা দমে যায়। আহত গলায় বলে, 'কি বলছ তুমি? ও তোমার বন্ধু। একসময় তোমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। তোমার তো ওর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

তমাল অসহিষ্ণু গলায় বলে, 'ছোটোবেলায় অমন বন্ধু অনেক হয়। তা বলে সারাজীবন কেউ ওই বন্ধুত্ব বয়ে বেড়ায় না। তা ছাড়া বন্ধু হয় সমানে সমানে। সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলেছে। দেখ কি ধান্দা। এসেই হয়তো বলবে মেয়ের বিয়ে গলু সাহায্য কর। নয়তো ছেলের পড়া আটকে যাচ্ছে টাকা দে। দেখো তুমি যেন আবার দাতা কর্ণ হয়ে বসো না।'

অনন্যার এসব শুনতে একেবারেই ভালো লাগছিল না। ধৈর্য হারিয়ে বলে, 'কারো সম্বন্ধে আগ বাড়িয়ে অশোভন মন্তব্য করা শুধু কুরুচির পরিচয় নয়, তাকে অপমান করা। কারো জন্য যদি কিছু করতে না পারো করো না, কিন্তু অযথা অপমান করো না। আর বদ্রীর যদি সাহায্যের দরকারই হয় তোমার কাছে হাত পাড়বে না। তার কত্তামা আছেন।'

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যেমন হয়, তমাল কথা বাড়ায় না।

শ্রাদ্ধের পরদিন সন্ধ্যাবেলায় বদ্রী এসে হাজির। শ্যামলের সঙ্গে দেখা। জিগ্যেস করে, 'গলু কোথায় রে শ্যামল।'

-দাদা বউদি ওপরের ঘরেই আছে বদ্রীদা। তুমি যাও।

বদ্রী গলা ছেড়ে ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি বায়। 'গলু ঘরে আছিস!'

অনন্যা দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিল। বদ্রীকে ভেতরে ডেকে খাটে বসতে বলে। কিন্তু সে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে, 'না গো বউদিমণি, মাটিই আমার খাঁটি' বলে মেঝেতে লেপটে বসে। তমালের দিকে ফিরে বলে, 'তোর সাথে দরকার বলছিলাম না। একটা জিনিস দেব বলে নিয়ে এলাম।' বদ্রী সুতোর বাঁধন খুলে একটা কাগজ মেলে ধরে। তাতে হারাধনবাবুর মুখের একটা পোট্রেট।

ছবি দেখে অনন্যা উচ্ছ্বসিত। তমালকে বলে, 'দেখ, দেখ কি সুন্দর এঁকেছে, তাই না!'

বদ্রীর প্রশংসায় তমাল বিরক্ত। সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

বদ্রীর অতশত দেখার সময় নেই। তার মুখে তৃপ্তির হাসি। 'আমার নিজে হাতে আঁকা গো বউদিমণি। গলুকে দেব বলে তুলে রেখেছিলাম। বাঁধিয়ে নিয়ে ঘরে টাঙিয়ে দিও। রোজ কত্তাবাবাকে দেখবে, আর এই গরীব মানুষটার কথাও মনে পড়বে।' বদ্রী নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়ে।

আরও দু-চার কথার পর বদ্রী উঠে যায়।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেছে। দূরের আত্মীয়-স্বজন যারা এসেছিলেন সকলেই চলে গেছেন। বাড়ি এখন খাঁ খাঁ। জিনিসপত্রে অগোছালো হয়ে পড়েছে বাড়িটা। সাবিত্রী দেবীর নিজের পক্ষে গোছানো সম্ভব নয়। ছোটো ছেলে শ্যামল মনোহারি দোকান চালিয়ে মার কাজে সাহায্য করতে পারে না। সাবিত্রী দেবী বদ্রীকে ডেকে পাঠান।

বদ্রী এসেই বাড়ি মাথায় করে। 'কি করতে হবে কত্তামা বলো। তোমায় কোথায় রাখতে হবে।'

সদ্য শোক কাটিয়ে ওঠা সাবিত্রী দেবী বদ্রীর কথায় হেসে ফেলেন। 'দূর পাগল ছেলে, আমাকে কোথায় রাখবি। আর যদি রাখতেই হয় তোর কত্তাবাবার কাছে রেখে আয়।'

বদ্রী অপ্রস্তুত। 'আমি কিন্তু অত ভেবে বলিনি কত্তামা।'

- জানি। সাবিত্রীদেবী বদ্রীর মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দেন। 'নে আগে কিছু মুখে দে, তারপর কাজে হাত লাগা। দেখছিস তো ঘরদোর জঞ্জাল হয়ে আছে।'

বাড়ির কাজের মেয়ে রীণাকে সঙ্গে নিয়ে বদ্রী সাফসুতরোর কাজে লেগে পড়ে। নীচের ঘরগুলো হয়ে গেলে ওপরে ওঠে। তমালের ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে খাটের তলায় অন্ধকারে পড়ে থাকা একটা দুমড়ানো কাগজ খুঁজে পায়। আলোয় এনে দেখে তার

আঁকা কত্তাবাবার ছবি। গলু নিয়ে যায়নি। এত যত্নে আঁকা ছবিটার পরিণতি দেখে মনটা হাহাকার করে ওঠে। বদ্রীর মনে হয় গলু ছবিটাকে নয় তার বুকটাকেই দুমড়ে পিষে দিয়ে গেছে। সে দুহাতে ছবিটা ধরে ঠায় বসে থাকে।

কত্তামা তাড়া দেন। 'কিরে বদ্রী তোর হল কি। কাজ করতে এসে ঝিম মেরে বসে রইলি যে।'

বদ্রীর সাড়া নেই। এগিয়ে এসে হাতে ধরা ছবিটা দেখে সাবিত্রী দেবী যা বোঝার বুঝে নেন। শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা দিয়ে আঁকা বদ্রীর এই ছবি তমালের কাছে কানাকড়িও মূল্য নেই। তাছাড়া বাবার ছবি ফ্ল্যাটে রেখে নষ্ট করার মতো বাড়তি জায়গাই বা তার কোথায়?

দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বদ্রীকে বলেন, 'কি এত ভাবছিস! তাড়াহুড়োয় নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। তুই বরং এক কাজ কর, ওটা তুই নিয়ে যা। তোর ঘরেই এই ছবি মানাবে ভালো। তোকেও তো কত্তাবাবা ছেলের মতো দেখত। দেখত না!'

বদ্রী মুখ তোলে। বিষণ্ণ সেই মুখ ক্রমে বদলে যায় সব পাওয়ার সুখে।

With Best Compliments from :

Dhanuka Agritech Ltd.

লক্ষ্মণ রেখা

আনন্দ সেন

'Great job Subho, I think you wowed them.'

আধ ঘণ্টার presentation এবং আরও আধ ঘণ্টার প্রশ্নোত্তরের পালা শেষ হলে শুভেন্দু বাথরুমে এসেছিল একটু মুখেচোখে জল দিতে। Richard-এর প্রশংসাটা তার ভালোই লাগে। গত দু-মাস ধরে শুভেন্দু আর তার দল presentation-টা নিয়ে খুবই খেটেছে। একটা নতুন product launch করছে তারা, একটা পরবর্তী প্রজন্মের mobile device। এটার demonstration দেবার জন্যই Dallas এসেছিল সে আর তার সতীর্থ Richard Holmes। Sprint-এর বড়কর্তাদের সামনে presentation। গত কয়েক রাত ঘুমোয়নি। খুব নার্ভাস ছিল। আজ মনে হচ্ছে এতদিনের কষ্ট সার্থক। কন্ট্রাক্ট-টা হয়তো ওরা পেয়েই যাবে।

শুভেন্দু building-এর বাইরে বেরিয়ে সিগারেট ধরায়। এই সিগারেট খাওয়া নিয়ে অলির সঙ্গে ওর প্রতিনিয়ত অশান্তি চলে। শুভেন্দুর পক্ষে দাঁড় করবার মত যুক্তি খুব একটা নেই, superficial addiction, যখন ইচ্ছে ছাড়তে পারে—এইসব বলে কিছুদিন চালাবার চেষ্টা করেছিল। তারপর জেরবার হয়ে ছেড়ে দিয়েছিল smoking। গত কয়েক মাস হল আবার শুরু করেছে, অবশ্য কম্‌সম্‌, লুকিয়ে চুরিয়ে। সেটা সহজ নয়। এখন আমেরিকাতে smoker হওয়াটা খুব ঝামেলার, প্রায় অস্পৃশ্য হয়ে থাকতে হয়।

শুভেন্দু রায়। Larsen Toubro Infotech, San Diego-য় মার্কেটিং বিভাগের বেশ উঁচু আসনে রয়েছে সে। কলকাতার এক সাধারণ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের স্নাতক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে মন্দ উন্নতি করেনি। দেশের এক company-র project-এর সুবাদে এখানে আসা। তারপর তার কাজে খুশী হয়ে American company-র চাকরির প্রস্তাব, সেই চাকরি থেকে অন্য চাকরি, ধাপে ধাপে পদোন্নতি খুব দ্রুত ঘটেছে শুভেন্দুর জীবনে। অবশ্য এই তরতর উন্নতির মূল চাবিকাটি শুভেন্দুর কর্মদক্ষতা এবং কাজের প্রতি sincerity। প্রত্যেকটি কাজ সে নিজে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। বিশ্লেষণ করে, সমস্যা হলে পিছিয়ে যায় না, নিজে সামনে থেকে সমাধানের চেষ্টা করে। কাজের ব্যাপারে কোনো compromise নেই। এমনকি পারিবারিক ক্ষেত্রেও। একবার বুবাইয়ের ধুম জ্বর, বেশ দুতিনদিন ধরে চলছে, ঠিক সেই সময় একটা project-এর deadline। প্রতিদিন রাত দেড়টা-দুটোয় বাড়ী ফিরছে শুভেন্দু। অনি ভীষণ রাগারাগি করেছে, বলেছে 'এ কেমন কাজ বাপু যা তোমায় সংসারকে অস্বীকার করতে শেখায়?'

শুভেন্দু বলেছে, 'এ কাজটাও সংসারেরই প্রয়োজনে। তাছাড়া emergency তো নয়।' অবশ্যই শুভেন্দু অকৃতজ্ঞ নয়। Project-টা শেষ হতেই সে ছেলে বৌকে নিয়ে গেছে Europe-এ, surprise trip-এ। বুবাই খুব enjoy করেছিল সেই বেড়ানোটা।

শুভেন্দু নির্দিষ্ট সময়ের বেশ খানিকটা আগেই airport-এ check-in করে নেয়। আজকাল সিকিউরিটি-র কড়াকড়ির জন্য বড্ড সময় লাগে। গেটের সামনে এসে সে ল্যাপটপ খুলে বসে। তার সামনে দিয়ে অসংখ্য চলমান মানুষের ব্যস্ততা, প্লেন আসছে, যাচ্ছে। শুভেন্দু লক্ষ্য করে মানুষগুলো আলাদা, কিন্তু তাদের সবার ভাবভঙ্গী প্রায় এক রকম, কেউ ল্যাপটপে, কেউ phone-এ অনর্গল কথা বলছে, কেউ বা উর্ধশ্বাসে ছুটছে পাছে ফ্লাইট মিস্ করে যায়, কেউ একমনে বসে পড়ছে বই, সবটাই যেন কেমন একটা গতিময় একঘেয়েমী। তাপসদার একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায় শুভেন্দুর—'জানিস শুভ, আমরা মানুষগুলো সবাই ইঁদুরের মত। এদিক সেদিক যাই, একটু খুট্‌খাট্ করি, এটা কাটি, সেটা কাটি, আবার ছুটি অন্য খাবারের লক্ষ্যে। সবাই দৌড়োচ্ছি, একটা অদৃশ্য বাঁশীওলা বাঁশী বাজিয়েই চলেছে। কখনও কখনও আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছেও যাই, সবার আগে। কিন্তু ইঁদুর তো, ছোটা থামে না।

তাপসদা।শু ভেন্দুরঅ ঙ্কেরম াস্টারমশাই।অ ঙ্কক তে শখাতেনম নে নেই,কি ন্তু প্রচুর গল্প কবিতা বলতেন তাপসদা। তাপসদা একটা শখের দলে অভিনয় করতেন। সুন্দর ভারী গলা, যাকে বলে baritone voice। সেই গলায় একটার পর একটা আবৃত্তি করতেন তাপসদা জয়, শঙ্খ, শক্তি, সুনীল, জীবনানন্দ এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাপসদার একটা অদ্ভুত অনুভূতি ছিল। বলতেন, রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে রুমালের মত, সবসময় সাথে আছে, দরকারমত একটু মুখ, চোখ মুছে ক্লেদমুক্ত হই। বুড়োটা সব কিছু নিয়ে কবিতা লিখেছে, বুঝলি শুভ। তোর এমন কিছু অনুভূতি নেই যেটা রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় ধরেননি।

তাপসদার কথা পুরোটা বোঝেনি শুভেন্দু, কি করেই বা বুঝবে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাঠ্য বইয়ের বাইরে কতটুকুই বা পরিচয়। কিন্তু মনে আছে একটা ঘটনা। শুভেন্দুর বাবা চাকরি করতেন Indian Forest Service-এ। সেবার এক বছরের জন্য উড়িষ্যায় transfer, একটা survey-র ব্যাপারে। পুজোর ছুটিতে মা-র সাথে শুভেন্দু চলেছে বাবার কাছে। ট্রেনটা একটু before time station-এ এসে গেল, তখনও রাত্রির অন্ধকার কাটেনি। একটা স্টীমার লঞ্চে শুভেন্দুদের নদী পার হতে হবে, মহানদী। সাইকেল রিক্সা শুভেন্দু আর মাকে নামিয়ে দিল লঞ্চ ঘাটে। সেদিন হেমন্তের শিরশিরানি গায়ে জড়িয়ে মার পাশে বসে ভোর হওয়া দেখেছিল কিশোর শুভেন্দু। কেউ যেন একটা অদৃশ্য ডিমার দিয়ে আস্তে আস্তে আলো জ্বালাচ্ছে, আর প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে রঙ, কালো থেকে ফিকে সাদা, তারপর গোলাপী, কমলা আর শেষে সোনালী। গাছের পাতা আর ফুলও সেই আলোর নিয়ন্ত্রণে জাগছে, একটা slow motion ছবির মতো। শুভেন্দুর আশ্চর্য ভাবে মনে পড়ে গিয়েছিল তাপসদার কাছে শোনা কয়েকটি লাইন—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি/ জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
প্রভাত হল সেই কি জানি হল একি/ আকাশ পানে চাই কি জানি কারে দেখি।
পূরবমেঘমুখে পড়েছে রবিরেখা/ অরুণ রথচূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব/ মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব।

সেদিনের মতো মার পাশাপাশি বসার সুযোগ আর কখনও হয়নি শুভেন্দুর। মাকে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সারাদিন সংসারের হাঁড়ি ঠেলতেই দেখেছে। শুনেছে বিয়ের আগে মা নাকি খুব ভালো নাচতেন। মাকে কোনোদিন নাচতে দেখেনি শুভেন্দু। খালি একবার এক গভীর ঝড়জলের রাত্রে ঘুম থেকে জেগে মাকে পাশে না দেখে সে বিছানা থেকে উঠে এসেছিল। দেখেছিল মা বসে আছেন বারান্দার কালো পাথরে বাঁধানো বেদীটার উপর। বুকে চেপে আছেন একজোড়া ঘুঙুর। আর রাস্তার আলোয় তাঁর দুচোখ দিয়ে ঝরে যাওয়া জল গালের উপর চিক্‌চিক্ করছে।

পরদিন মাকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। কে জানে, হয়তো সেখানে বাবা ছিলেন বলেই। ভেবেছিল পরে, বড় হয়ে একদিন জিজ্ঞেস করবে। তার অবশ্য আর সুযোগ হয়নি। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মার অসুখটা ধরা পড়ল। Pancreatic cancer, ডাক্তার নাকি বলেছিলেন advanced stage, operate করলে মাস ছয়েকের মেয়াদ, তার চেয়ে ওষুধ চলুক, কিছুদিন তো বাঁচবে। এসব অবশ্য ওর পরে শোনা কথা। চোখের সামনে যেটা দেখেছিল, সেটা মার তিলে তিলে না-বাঁচার দিকে এগোনো। মার ফর্সা, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারাটা শুকিয়ে কালো,অস্থিসর্বস্ব হয়ে যেতে দুবছরের বেশি লাগেনি। শেষের দিকে মা আর কোনো খাবার খেতে পারতেন না, অসুখ আস্তে আস্তে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকেও গ্রাস করেছিল, সারাদিন মা দিনরাত্রের নার্সের সঙ্গে খাবার খেতে চেয়ে ঝগড়া করতেন, মুখরোচক খাবারের জন্য ছুঁকছুঁক করতেন। শুভেন্দু দেখেছে বাড়ীতে অতিথিকে পরিবেশন করা খাবারের অবশিষ্ট তারা চলে যাবার পর ক্ষিপ্রবেগে তুলে নিয়ে মুখে পুরছেন। বাবা বাধ্য হয়ে refrigerator-এ তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। নার্সের কাছে থাকত চাবি। একদিন রাত্রে ভীষণ চেঁচামেচি শুনে শুভেন্দু ঘুম ভেঙে দেখে নার্সের সাথে মার তুমুল ঝগড়া। মা নাকি নার্সের ব্যাগ থেকে চাবি চুরি করে ফ্রিজ খুলতে গিয়েছিলেন, নার্স ধরে ফেলেছে। এইসময় শুভেন্দু মাকে দেখত দূর থেকে, কাছে ঘেঁষত না বিশেষ। মার কি হয়েছিল, কেউ তাকে বলেনি। কিন্তু সে বুঝেছিল যা হয়েছে তা হয়তো সারার নয়।

মা চলে যান শুভেন্দুর মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক পরেই, হয়তো তার পরীক্ষাটা যাতে ঠিকমত হয়, সেকথা ভেবেই। বাবা তারপর এক বছর যুদ্ধ করেছিলেন একাকীত্ব আর ডিপ্রেশানের সাথে। বাবার ঘরে বিছানায় তাঁর নিথর হয়ে যাওয়া দেহের পাশে bedside table-এ ঘুমের ওষুধের খালি শিশির তলায় একটা কাগজ চাপা দেওয়া ছিল, তাতে লেখা,

আজিকে হয়েছে শান্তি, জীবনের ভুল ভ্রান্তি/ সব গেছে চুকে।
রাত্রিদিন ধুক্‌ধুক্ তরঙ্গিত দুঃখ সুখ/ থামিয়াছে বুকে।
যত কিছু ভালোমন্দ যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব/ কিছু আর নাই
বলো শান্তি, বলো শান্তি, দেহ সাথে/ সব ক্লান্তি হয়ে যাক ছাই।

তার নীচে দুটো শব্দ—'শুভ, সরি।'

★ ★ ★

This is a pre-boarding call for American Airlines Flight 2211 going to San Diego. চট্‌কা ভাঙে শুভেন্দুর announcement-এ। তাড়াতাড়ি ল্যাপটপ গুটিয়ে তৈরি হয় প্লেনে ওঠার জন্য। যদিও ও সচরাচর business class-এ যাতায়াত করে। এবার secretary-র গড়িমসির জন্য economy class ছাড়া টিকিট পায়নি। ফলে শুভেন্দুকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। বুবাই যখন ছোটো ছিল তার দৌলতে শুভেন্দুরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে পারত। সে দিন গেছে।

প্লেনে উঠে গুছিয়ে বসে ল্যাপটপ খুলে দেখে ব্যাটারি শেষ। Airport-এ বসে দিবাস্বপ্ন দেখার সময় খেয়াল ছিল না। খেলে যা। এখন এতটা পথ 'কর্মহীন পূর্ণ অবকাশ'। যাক্, কি আর করা। শুভেন্দু ল্যাপটপ বন্ধ করে মাথা হেলিয়ে দেয়—

'অলকানন্দা মুখার্জী। আমার স্কুলের বন্ধু। সঙ্গীতভবনের graduate, দারুণ গাইছে। আজশি শিরম ধ্বে প্রাগ্রামঅ াছে,শু নতেয াবি?'শু ভেন্দুরম াসতুতোদি দিস হেলী কলকল করে ওঠে।

বাবার মৃত্যুর পর শুভেন্দু মাসীর বাড়ীতে থেকে পড়াশুনো শেষ করেছে। এখন Bangalore-এ একটা company-তে এন্ট্রি লেভেলে জয়েন করেছে, সঙ্গে করছে একটা IT management-এর কোর্স। কলকাতায় এসেছিল কাজ নিয়ে, তার সাথে সপ্তাহ খানেকের ছুটি।

—আমাকে ছাড়, সারা সপ্তাহ ছুটি, কলকাতায় এসেছি গায়ের ব্যথা মারতে, আমি আর কোথাও যাচ্ছি টাচ্ছি না।

—প্লীজ শুভ, আমারও তো একটা এসকর্ট দরকার, রাত হবে ফিরতে।

সহেলী তার থেকে বছর তিনেকের বড় হলেও ওরা খুব close, সমবয়সী বন্ধুর মত, ছোটোবেলা থেকেই।

—কিন্তু আমাকে একবার একটু জেঠুর বাড়ীতেও যেতে হবে, আরেকবার অনুনয় করে শুভেন্দু। আসলে তার সারা সন্ধে ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনবার প্রস্তাবটা খুব আকর্ষণীয় লাগছিল না।

—জেঠুর বাড়ীতে তুই কালও যেতে পারবি। আমি কখনও তোকে কিছু অনুরোধ করিনি, এই একবার কথা রাখবি না?

এরপর আর কিছু বলা চলে না। চলে গিয়েছিল শুভেন্দু। আর শুনেছিল অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত। প্রাণভরে, এই প্রথম। অলি এক ঘণ্টা গেয়েছিল, কিন্তু তার রেশ রয়ে গিয়েছিল শুভেন্দুর মনে সারারাত। কিছু একটা ছিল অলির গলায়, গায়কীতে। মনে হচ্ছিল যেন সে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে না, বলছে নিজেরই কথা।

—তোর বন্ধু কি আবার গাইছে কোথাও next week-এর মধ্যে? সহেলীকে প্রশ্ন করেছিল পরের দিন।

—দেখিস্, সম্পর্কে দিদি হয়। হাল্কা ঠাট্টা সহেলীর। সহেলী অলিকে ফোন করে জেনেছিল একজনের বাড়ীতে একটা ঘরোয়া আসরে গাইবে অলি। একটু কাঠখড় পুড়িয়ে সেই অনুষ্ঠানের একটা নিমন্ত্রণও যোগাড় করেছিল।

—আপনার গান শুনলে মনে হয় একটা খোলা আকাশের নীচে বসে আছি, আর একটা বল্গাহীন বাতাস আমার চোখমুখ ধুইয়ে দিচ্ছে।

অনুষ্ঠানের শেষে শুভেন্দু বলে অলিকে।

—ধন্যবাদ! একটু লাল হয়ে গিয়েছিল কি অলি?

—আমি Bangalore-এ থাকি। মাঝে মাঝে যদি কথা বলতে ইচ্ছে হয়, email পাঠাতে পারি? আর একটু সাহসী হয় শুভেন্দু।

একটু থমকায় অলি। তারপর একটা কাগজে নিজের email id লিখে দেয় শুভেন্দুকে—ঠিক আছে, উত্তর নাও পেতে পারেন কিন্তু।

উত্তর অবশ্য দিয়েছিল অলি। প্রথমবারেই নয়, শুভেন্দু বেশ কয়েকটা পাঠানোর পর যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে প্রায়, তখনই। একবার দরজা খোলার পর অবশ্য শুভেন্দুকে আর বেশি চেষ্টা করতে হয়নি। অলিকে কাছ থেকে জানার সময় বুঝেছে যেঅ াদতেচ াপাস্বভাবেরঅ লিরহ াদয়প্রকাশেরজ ন্য email-এরঅ াড়ালটাএ কটা অত্যন্ত জরুরি অনুঘটক।

আর একটা জায়গায় অলি নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরত। সেটা শান্তিনিকেতন। শুভেন্দু আর অলি বিয়ের পর একবার শান্তিনিকেতন গেছিল। বোলপুরে নামতে না নামতেই অলির মুখচোখের চেহারা একেবারে পাল্টে গেল। অনেক চেনামুখের সাথে গল্প করতে করতেই সাইকেল রিক্সা চেপে তারা পৌঁছে গেল campus-এ। পুরোনো বন্ধুরক াছে থকেদ ুটোস াইকেলধ ারক রেত ারাে বরিয়ে পড়ল—প্রান্তিক,ে খায়াই, কোপাই, সোনাঝুরি। অলি যেন অনেকদিন পর ঘরে ফিরেছে, তার মুখচোখে এক অদ্ভুত আলো। সোনাঝুরিতে পৌঁছে পাগলের মতো ছুটতে থাকে অলি, ছুটতে ছুটতে একসময় বসে পড়ে মাটিতে, সারা মুখে মাথায় মেখে নেয় ধুলোমাটি। তার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে—আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। শুভেন্দু দুচোখ ভরে দেখতে থাকে এই নতুন অলিকে, আবার মনে পড়ে যায় তাপসদার কাছে অনেকদিন আগে শোনা,

জগতের মাঝে যত বিচিত্র তুমি হে/ তুমি বিচিত্ররূপিনী

অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে/ আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে

দ্যুলোকে ভুলোকে বিলসিছ চলচরণে/ তুমি চঞ্চলগামিনী।

শুভেন্দু সেদিন জানতে পারল সে আমেরিকা যাবে, রাত্রের flight-এ Bangalore থেকে কলকাতা এসে সোজা অলির বাড়ী হাজির হয়। লেকের ধারে দুজনে মুখোমুখি বসে। শুভেন্দু বলে,

—আমাকে বিয়ে করো অলি। পূর্ণ করো আমায়।

—কিন্তু শুভ, তোমার, আমার পথ যে ভিন্ন গতিমুখী। তুমি থাকো তোমার কাজকর্ম নিয়ে, তার বাণিজ্যিক ভাবনা, তার প্রয়োগ, তার মূল্যায়নও জাগতিক। আর আমার ঘোরাফেরা অলস রোমান্টিকতার পরিধির মধ্যে। আমার শিল্প মানুষকে আনন্দ দিতে পারে, রুটিরুজির জোগাড় করতে পারে না।

—রুটিরুজির জোগাড় আমি করব অলি, তুমি আমাকে আনন্দ দিও।

—কিন্তু আমার গান?

—তোমার গান থাকবে অলি। তুমি থাকবে তোমার গান নিয়ে, আমি বাধা দেব না। তোমার গানই তো হবে আমার প্রাণের শান্তি, ঘরে ফেরার তাড়া। একটা গাইবে আজ, আমার জন্য?

গেয়েছিল অলি—আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন।

শুভেন্দু আর অলি রেজিস্ট্রি করেছিল এক মাঘী বিকেলে। তখন শুভেন্দু USA-তে পার্মানেন্ট চাকরির offer পেয়েছে। অলির বাবা মা চেয়েছিলেন সামাজিক অনুষ্ঠান করতে, কিন্তু শুভেন্দু চায়নি। অলিও আপত্তি করেনি শুভেন্দুর মুখ চেয়ে। শুধু বলেছিল—বাবা মা চান রেজিস্টার যেন আমাদের বাড়ীতে আসেন। খুব কাছের কিছু লোককে আসতে বলব, একটু চা মিষ্টি খেয়ে যাবে।

সহেলী সাক্ষী হয়েছিল ওদের বিয়েতে, কপট রাগের ভান করে অলিকে বলেছিল—বয়েসে ছোট ছেলেটার মাথা এমন করে খায়?

আরও বছরখানেক লেগেছিল শুভেন্দুর অলিকে নিয়ে আসতে USA-তে। অলির তখন গানের জগতে খানিক নাম ডাক হয়েছে। দুটো CD বেরিয়েছে। বিয়ের পর প্রথম দু-তিন বছর বেশ খানিকটা সময় অলি কলকাতায় থাকত, অনুষ্ঠান করত, ওর গানের জগতের সম্পর্কগুলোকে আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিত।

তারপর বুবাই এল। ছোট্টো বুবাইকে নিয়ে হিমসিম খেতে লাগল অলি। কলকাতা বা USA দু-জায়গাতেই। আস্তে আস্তে কলকাতায় যাতায়াত কমতে লাগল। ইতিমধ্যে শুভেন্দুও উপরে উঠেছে কয়েক ধাপ। ওরা move করেছে San Diego-তে। অলি জড়িয়ে গেল সংসারের ঘেরাটোপে। বনের পাখি বন্দী হল খাঁচায়।

প্রথম প্রথম অলি খুব চেষ্টা করেছিল। San Diego-র বাঙালি সংখ্যা কতই বা? তবু তাদের নিয়ে একটু বসন্তোৎসব, বৃক্ষরোপণ—অলির চেনা পৃথিবীর ছোঁয়া পাবার প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু কিছুদিন পরেই তার উৎসাহে ভাঁটা পড়তে লাগল। অলির চেনা পৃথিবী অন্যদের অচেনা, তাদের দৃষ্টির গভীরতা নেই, তারা অভ্যস্ত চিন্তা না করতে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাথে অলির মতান্তর শুরু হল। তারা চায় সস্তার মনোরঞ্জন, অলি তার শিল্পের সাথে কোনো আপোস করতে রাজি নয়। এর মধ্যেও আছে বাঙালিদের পারস্পরিক বিবাদ, একের পিছনে অন্যের কুৎসা রটনা। এসব ভালো লাগে না অলির। প্রতিবাদও করে সে। ফলে San Diego-র বাঙালি মহলে নাম কিনেছে অহঙ্কারী বলে। শুভেন্দু মাঝে মাঝে অলিকে বোঝানোর চেষ্টা করে।

—কি দরকার ঝামেলায় গিয়ে, তোমাকে দুটো গান গাইতে বললে তুমি গেয়ে এসো, উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঢোকার দরকারটা কি?

—কিন্তু আমি কি গাইব, কখন গাইব, কিভাবে গাইব, সে ব্যাপারে আমার কোনো মত থাকবে না? এখানে ভালো গানের কদর কেউ করতে পারে না।

—কিন্তু তুমি তো নিজের আনন্দের জন্যই গাও, কেউ কদর নাই করল।

—শুভ, প্রত্যেক শিল্পী চায় তার শিল্পের স্বীকৃতি, appreciation, একজন প্রকৃত সমঝদারের কাছ থেকে। সেটাই তার এগিয়ে চলার পাথেয়। শুধু নিজের জন্য গান আমি কি করে গাইব শুভ?

—শিল্পীর শিল্পকর্ম কি তাহলে হাততালির মোহে, অভিনন্দন কুড়োনোর জন্য? Art is not for Arts sake?

—আমি performing arts-এর কথা বলছি শুভ, perform কি কেউ ফাঁকা মাঠে করে? তাছাড়া হাততালির কথা যখন বললেই, তার মোহ তোমার নেই? যদি না-ই থাকবে তাহলে প্রত্যেকটা project presentation নিজে করো কেন? তোমার জুনিয়রদের পাঠাও না কেন?

কথাটা সত্যি। গত কয়েক বছরে কাজ শুভেন্দুর জীবনকে প্রায় গ্রাস করে নিয়েছে। শুভেন্দুর সুপিরিয়াররাও তাদের এই worksholic কলিগকে রীতিমত সমীহ করে চলে। কিন্তু সব পয়সারই উল্টো পিঠ আছে। কাজের সাথে শুভেন্দুর মাখামাখি থাবা মারতে শুরু করেছে তার সাংসারিক জীবনে।

একদিন breakfast টেবিলে বসে বুবাই শুভেন্দুকে বলে, —বাবা একটা game খেলবে?

শনিবারের সকাল। শুভেন্দু Wall Street Journal-এর পাতা উল্টে পাল্টে দেখছিল।

—কি খেলা বুবাই?

—Guessing game। তোমাকে বলতে হবে কি কি জিনিস আমার ফেভারিট।

—ওকে, ঠিক আছে, বল।

—বলোতো, আমার ফেভারিট কালার কি?

—লাল।

—হোলো না, wrong ! আমার ফেভারিট কালার হল blue।

—ও তাই?

—আচ্ছা এবার বলোতো, আমার ফেভারিট খাবার কি?

—এটা আমি জানি, গোট্ মিট। কি, ঠিক হয়নি?

—এ বাবা, এটাও ভুল। চিংড়ি মাছ। বাবা হেরো।

—সত্যি? আচ্ছা আর একটা জিজ্ঞেস কর।

—আমার ফেভারিট Indian film star কে?

—শারুখ খান।

—আবার wrong, অভিষেক। বাবা তুমি কিচ্ছু পারোনি, জিরো পয়েন্টস্।

রোখ চেপে যায় শুভেন্দুর। প্রশ্ন করে যেতে বলে বুবাইকে একটার পর একটা। বুবাইয়ের প্রিয় খেলা, প্রিয় বই, প্রিয় সিনেমা, গান ... সবগুলো ভুল করে শুভেন্দু। বুবাই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

—বাবা is a loser ! বাবা is a loser ! ডিশ্ ওয়াশারে ডিশ্ ঢোকাতে ঢোকাতে ব্যাপারটা খেয়াল করছিল অলি। এবার সে ছেলেকে বলে—বুবাই এবার বাবাকে একটু breakfast খেতে দাও। তোমার তো খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি এবার তোমার ঘরে গিয়ে খেল। আমি একটু পরে আসছি। সুইমিং ক্লাসের জন্য রেডি হতে হবে। বুবাই উঠে যাবার পর খুব ঠাণ্ডা গলায় অলি বলল,

—শিগ্গির একদিন আসবে যখন বুবাই চাইবে তার বাবা এই খেলাটায় জিতুক, অনেক points পাক। তখন কি করবে শুভ?

শুভেন্দু বুঝতে পারছিল সুর কাটছে। কারণে, অকারণে অলি চিৎকার করে ওঠে, শুভেন্দুও মাথার ঠিক রাখতে পারে না। ঝগড়াঝাটি সব দাম্পত্য সম্পর্কেরই অঙ্গ, কিন্তু এই ঝগড়াগুলোর যেন কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই, এগুলো যেন কোনো অজানা বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, একটা কোনো অদৃশ্য মানসিক পীড়ার প্রতিফলন।

একদিন শুভেন্দু অলিকে জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে বলো তো? আজকাল কথায় কথায় এত ঝগড়া হয় কেন? আগে তো এমনটা ছিল না।

অলি যেন এই প্রশ্নেরই অপেক্ষায় ছিল।

—জানি শুভ, জানি। আমিও তোমাকে বলব ভাবছিলাম। আর আমি এর সমাধানও জানি।

—জানো? অবাক হয়ে তাকায় শুভেন্দু।

—হ্যাঁ শুভ। কলকাতায় ফিরে চলো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে শুভেন্দু। তারপর আস্তে আস্তে বলে—তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? কি বলছ?

—পাগল হইনি শুভ। লক্ষ্মীটি, ফিরে চলো। তুমি সুপ্রতিষ্ঠিত। ভালো চাকরি পেয়ে যাবে, আর আমি গান গাইব প্রাণভরে। আমার বেশি কিছু চাই না। তিনজনে মিলে আমরা সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারব।

—আমি কলকাতায় ফিরতে চাই না অলি। কলকাতার সাথে আমার বাবা-মা-র স্মৃতি, আমার অসম্পূর্ণ কৈশোরের স্মৃতি, আমি ভুলতে চাই সেগুলো।

—ওটা তোমার অজুহাত শুভ। কলকাতায় তোমার ভালো লাগার স্মৃতিও আছে। ওখানেই আমাদের পরিচয়, আমাদের হাত ধরে পথচলার শুরু।

—তাও! কলকাতা আমায় যা দিয়েছে, নিয়েছে তার থেকে অনেক বেশি।

—গান ছাড়া আমি বাঁচব না শুভ। আমাকে গাইতে দাও।

—বেশ তো, গাও না তুমি। এখন তো বুবাই একটু বড় হয়েছে, তুমি আবার কলকাতায় যাতায়াত শুরু কর।

—আমি এখানে পারছি না শুভ, হাঁপিয়ে উঠেছি। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে এখানে। আমি খোলা হাওয়ায় বাঁচতে চাই।

—ঠিক আছে, একটু ভেবে দেখি।

—তাড়াতাড়ি করো শুভ, দেরী কোরো না। আমাকে, আমাদের শেষ হয়ে যেতে দিও না।

সেদিন শুভেন্দু শুনেছিল music room-এ বসে অলি গান গাইছে, একা একা। অনেক রাত, নাকি সারারাত—শুভেন্দু জানে না, ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ফ্লাইটটা সময়ের কিছু আগেই San Diego পৌঁছোলো। ঘটনাবিহীন বিরক্তিকর ফ্লাইটে শুভেন্দুর সময় কেটেছে শুধু পাশের স্থূলকায়া সহযাত্রীনির নাসিকাগর্জন শুনে এবং কাঁধের উপর তার মাথার ভার বহন করে। প্লেনটা টাচ্ ডাউন করতেই পার্শ্ববর্তীনি ধড়মড় করে জেগে উঠে তার আই-ফোনে আলাপচারিতা শুরু করে দিলে। শুভেন্দু মনে মনে তার secretary-র মুণ্ডুপাত করে। আগে বুকিং করলে ইকনমি ক্লাসে ফ্লাই করতে হত না, যত্ত সব। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছোতে পারলে সে বাঁচে। টায়ার্ড লাগছে, ভালো করে চান করা দরকার।

ট্যাক্সিটা বাড়িতে যখন নামিয়ে দিল শুভেন্দুকে, তখন আটটা বাজে। গ্রীষ্মকাল, ফলে চারিদিকে আলো ঝলমল করছে। শুভেন্দু বাড়িতে ঢুকে জুতোটা খুলতে খুলতে অভ্যাস বশে 'I am home' বলতে গিয়ে থমকে যায়। খেয়াল হয় আজ বুবাই দৌড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরবে না। মাস ছয়েক হল অলি বুবাইকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে। আর ফিরবে না। যাবার তিনদিন আগে শুভেন্দুকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানায় অলি। বেশি কিছু বলেনি শুভেন্দু, চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাটি করেনি আর কতই বা করবে? শুধু বলেছিল, বুবাইকেও নিয়ে যাচ্ছো!

—ওকে এখানে দেখবে কে? অলির গলায় হাল্কা ঠাট্টা।

—কিন্তু ও-র স্কুল ...

—ও ও-র মায়ের কাছে থাকবে শুভ, কলকাতার স্কুলে পড়বে, ওখানে যে কোনো ভালো স্কুলের অভাব নেই, তা তো জানোই।

—কেন এটা করছ অলি? আমি তো তোমার গানে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়াইনি।

—ঠিক্, কিন্তু তুমি আমার গানে প্রেরণাও কখনও হওনি। তোমার জীবন আর আমার গান দুটো সমান্তরাল সরলরেখায় চলেছে। তুমি কখনও তাকে ছোঁবার চেষ্টাই করনি।

—কি বলছ অলি?

—ঠিকই বলছি। শেষ কবে তুমি আমার গান শুনতে চেয়েছ ভেবে দেখো তো?

—কিন্তু তুমি তো সর্বক্ষণই গান গাও। কখনও গুনগুন করে, কখনও খোলা গলায়। আমার তো ভালো লাগে শুনতে।

—সে তো আমার ইচ্ছেয় গাই শুভ। তোমার ইচ্ছায় কই? আমার গান হয়তো তোমায় শান্তি দেয়, কিন্তু ঘরে ফেরার তাড়া তো আর দেয় না।

—তোমাদের চলবে কি করে? শুভেন্দু শুকনো গলায় প্রশ্ন করে।

—আমার বন্ধু সুপর্ণা ওর স্কুলে একটা চাকরি জোগার করে দিয়েছে, মিউজিক টিচারের। একটা দুটো রেকর্ডিং-এর সুযোগও আসতে শুরু করেছে। আপাতত মা-বাবার কাছে গিয়ে থাকব, কিন্তু ওদের মুখাপেক্ষী হয়ে নয়। ভয় নেই, তোমার কাছে হাত পাতব না। একটু থেমে বলে অলি।

—অলি, please শুভেন্দুর গলাটা কাতর শোনায়।

ফিরে যাবার পর পৌঁছানো সংবাদ পাঠিয়েছে অলি email-এ। সপ্তাহে একবার skype-এ বুবাইয়ের সাথে কথা হয়। অলি মাঝেমাঝে সামনে আসে। শুভেন্দু খাওয়া-দাওয়াঠি কমতক রছেকি না,ে প্রসারেরও যুধঠি কমতখ াচ্ছেকি না—এরকম দুচারটে প্রশ্ন করেই সরে যায়। প্রথম প্রথম ফোনে অলিকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছে শুভেন্দু। এখন আর বিশেষ কথাও হয় না। সহেলীর কাছে মাঝে মাঝে খবর

পায়, অলি দু-একটা অনুষ্ঠানে গান গাইবার সুযোগ পেতে শুরু করেছে, প্রশংসাও পেয়েছে অল্প।

★ ★ ★

শাওয়ারের তলায় বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে শুভেন্দু। ঠাণ্ডা জলের কণাগুলো তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে একটা আরাম ছড়িয়ে দিচ্ছিল। স্নান করে বেশ তরতাজা লাগে তার। একটা tee-shirt আর শর্টস পরে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরায়। তারপর কি মনে করে guest-room-এর বন্ধ দরজাটা খোলে। চলে যাবার আগের কয়েকমাস অলি রাত্রে এখানে শুত। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলতে দেখেছে এ ঘরে। শুভেন্দু খেয়াল করে বেডসাইড টেবিলের পিছনে একটা বই পড়ে আছে, নিশ্চয় ক্লীনারদের কাণ্ড। বইটা তোলে সে, সঞ্চয়িতা। আনমনে উল্টোতে উল্টোতে একটা পাতায় এসে থমকে যায় সে। কতগুলো লাইনের তলায় পেন্সিলের দাগ।

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন হয়েছে ভোর।

মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে, রয়েছে ডোর।

নেই আর সেই চুপিচুপি চাওয়া। / ধারে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া—

চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে ঘুমের ঘোর।

বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ বাহুতে মোর।

সিগারেটের আগুন আঙুল পুড়িয়ে দেয় শুভেন্দুর। তাড়াতাড়ি আগুন নিভিয়ে সিগারেটটা ফেলে দেয় সে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বইটা তুলে নিয়ে পড়তে থাকে,

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর আগের মতো। /জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা জীবন হত।

কে জানে কাননে ফুল ফোটে কিনা— /আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা—

কে জানে সে ফুল তোলে কিনা কেউ ভরি আঁচোর

কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কিনা সারা প্রহর।

শুভেন্দু বইটা বন্ধ করে সিঁড়ির landing-এর দেয়ালে টাঙানো মার লালচে হয়ে যাওয়া ছবিটার সামনে এসে দাঁড়ায়। বিয়ের সময়ের ছবি। বেনারসী আর গয়নায় মাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। শুভেন্দু বলে 'মা গো, আজ তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

মা হাসছেন।

শুভেন্দু প্রায় ফিসফিস করে যেন মায়ের কানে কানে বলছে এমনভাবে বলে,

'তুমি যা পারোনি, তোমার ছেলের বউ তাই পেরেছে। সংসারের লক্ষণরেখাটা পার হয়ে গেছে অলি।

প্রজাপতির নির্বন্ধ

সুপ্রিয় দত্ত

আমার কল্পনাশক্তি বোধহয় একটু কম।

ছোটবেলায় সংবাদপত্রের উপর রচনা লিখতে দিলে কিছুতেই কিছু মনে আসত না। সংবাদপত্রের উপকারিতার কথা ভাবতে বসলে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খবরটা ছাড়িয়ে চিন্তার দৌড় আর এক পাও এগোতে চাইত না। পরে বড়ো হয়ে জেনেছি যে সংবাদপত্রের উপকারিতা ও প্রয়োগ অনেক। রানারের মতো সূর্যোদয়ের পূর্বেই তাকে পৌঁছে দিতে হয় ঘরে ঘরে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক খবরাখবর। শুধু তাই নয়, আরো অনেক কিছুই তাকে সরবরাহ করতে হয়—কর্মখালি ও কর্মপ্রার্থীর খোঁজ, ব্যবসা-বাণিজ্যের গোপন খবর, শেয়ার বাজারের সর্বশেষ সংবাদ, গ্রহ-তারা-তিথি-নক্ষত্রর প্রয়োজনীয় টুকিটাকি, নানান সামগ্রীর চটকদার বিজ্ঞাপন আর পাত্র-পাত্রীর সন্ধান।

হ্যাঁ। পাত্র-পাত্রীর সন্ধান! আজকের যুগে ভাবতে অবাক লাগলেও একথা সত্যি যে আমাদের সমাজের অনেক জোড়মিলনেরই অগ্রদূত সেই মাল্টিপার্পাস সংবাদপত্র। কত অচেনা হৃদয়ের সেতুবন্ধন সম্ভব হয়েছে সংবাদপত্রের ঘটকতায়, কত দূরান্তস্থিত প্রাণ বাঁধা পড়েছে কৃষ্ণাক্ষরের শৃঙ্খলে, নেপথ্যে কত কুমারসম্ভব কাব্য রচিত হয়েছে সংবাদপত্রেরড ৈদ্যোগে,ম দনদেবেরক তশ রও ইএ কটিব. বিবাসরীয় পৃষ্ঠায়নি ক্ষিপ্ত হয়ে অভ্রান্ত লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছেছে। বহু শর আবার লক্ষ্যভ্রষ্টও হয়ে পড়ে। কত বিদেশ গমনেচ্ছু পাত্র ধনী কন্যার সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে এদেশেই মনোকষ্টে দিনাতিপাত করেন, আবার কত ম্যাট্রিক-স্ট্যাণ্ডার্ড বেকার যুবক 'শ্লিম ফর্সা গ্র্যাজুয়েট সুন্দরী গৃহকর্মনিপুণা, সংগীতজ্ঞা'র সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে কোনো চলনসই কনে দিয়েই কষ্টেসৃষ্টে কাজ চালিয়ে দেন।

সত্যি বলতে, আজকের যুগে 'সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা' না হলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কারণ প্রতিটি বিজ্ঞাপনেই অনিবার্যভাবে চাওয়া হয় প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা বা গৌরবর্ণা, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী। অনেকে তো সোজাসুজিই লিখে দেন 'প্রকৃত সুন্দরী ও ফর্সা না হইলে পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন।' কেউ কেউ আবার বেশী নিরীহ ও শান্তিবাদী হওয়ায় এই লিখেই ক্ষান্ত হন না। তাঁরা লেখেন—'নির্ঝঞ্ঝাট পরিবারের জন্য প্রকৃত সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পাত্রী চাই।' প্রকৃত সুন্দরীরা সচরাচর ক্লিয়োপেট্রার মতো অশান্তির অগ্রদূত হন—এরূপ ধারণা থেকেই সম্ভবত তাঁরা

আগেভাগে ঝঞ্ঝাটের প্রতি তাঁদের বিরূপতা জানিয়ে দেন। অনেকে অবশ্য সুন্দরী-টুন্দরীর ধার ধারেন না, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক উদার। তাঁরা চান 'kind, broad outlook, educated' মহিলা।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'আমরা বসন্তের টিকা লই; ওলাউঠা হইলে নুনের জলের পিচকিরি লইবার আয়োজন করি, ... এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রভরা তাবিজটাকে পেটভরা পিলের উপর ঝুলাইয়া রাখি।' কুসংস্কার ও বিজ্ঞানের এই দ্বন্দ্বের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত বিজ্ঞাপনে পাওয়া যায়। তাই 'convent educated and medical graduate'-ও বিজ্ঞাপনের শেষে জানাতে ভোলেন না যে তিনি বৈদ্য মৌদগল্য গোত্রভুক্ত। অবশ্য বর্ণপ্রথার প্রতি অনেক দীর্ঘপ্রবাসী যুবক এমনই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন যে সোজাসুজি বিজ্ঞাপনে বলে দেন যে 'she must be of family having disbelief in caste system'। প্রতীচ্য সম্পর্কে অতিমোহগ্রস্ত যুবসম্প্রদায়ের দৌলতে আজকাল কন্‌ভেন্ট শিক্ষিতা কনেদের বিয়ের বাজার খুবই কদর। এই যুবকরা মিশনারী চুনকাম না থাকলে মেয়েদের জাতে তুলতে চান না।

একদিন ছিল যখন মোটা যৌতুক ছাড়া ভাল পাত্র হাতানো যেত না—আজকাল অবশ্য অনেক বিদেশফেরৎ সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রও স্পষ্ট জানিয়ে দেন 'দাবী নাই'। তাঁরা কনের গ্রহণীয়তা শ্বশুরের ঐশ্বর্য দিয়ে বিচার করেন না। বস্তুত কন্যার কাছ থেকে টাকা নেওয়া তাঁদের পৌরুষের পক্ষে অবমাননাকর। তবে এমন অনেক সুযোগ্য পাত্র আজও আছেন যাঁরা এজাতীয় সঙ্কীর্ণ লজ্জাসঙ্কোচের ঊর্ধে। তাঁরা স্পষ্টই বিজ্ঞাপনে জানিয়ে দেন যে বিয়েটা তাঁদের বিদেশযাত্রার উপক্রমণিকা মাত্র। বিদেশে যাবার টাকা পেলে তবেই তাঁরা কন্যার ভারগ্রহণ করতে প্রস্তুত। অবশ্য নারীপ্রগতির ফলে কন্যারা আজকাল আর ভারস্বরূপা নন। বস্তুত কিছুকাল আগে এরকম একটি বিজ্ঞাপন দেখা গিয়েছিল—'A man who finaly believes in the equality of the sexes seeks wife who can support him.'।

সাম্প্রতিক * নক্‌শালী পুলিশ হত্যার ফলে পুলিশ কর্মীদের বিয়ের বাজারে দর পড়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে যে জনৈক পুলিশ অফিসার পাত্রীসন্ধানে বিফল মনোরথ হয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন— 'Wanted a bride with moderately civilian leavings.'

আজকাল ইন্‌জিনিয়ার, ডাক্তার বা অধ্যাপকদেরই কদর বেশী। অবশ্য কেউ কেউ বোধহয় এঁদেরও সুযোগ্য পাত্র বলে গণ্য করেন না। তাই সেদিন বিজ্ঞাপন দেখলাম 'ডাক্তার, ইন্‌জিনিয়ার, অধ্যাপক কিংবা যোগ্য পাত্র চাই।'

বিজ্ঞাপনের ভাষা সংক্ষিপ্ত হয় বলে অনেক সময় অর্থ বিকৃত হয়ে পড়ে। পাত্রের আয় ৪০০ টাকার বেশী হওয়া প্রয়োজন বোঝাবার জন্য বিজ্ঞাপনে লেখা দেখলাম—'অন্তত ৪০০ পাত্র চাই।' দ্বাপর যুগে দ্রৌপদীর পঞ্চপতি সমাজ মেনে নিলেও, কলিযুগের নারীর এহেন উচ্চাভিলাষ বোধহয় আইনবিরুদ্ধ।

এব্রাহাম লিঙ্কনের কাছে কর্মপ্রার্থী এক যুবক তাঁর নিকট আত্মীয়দের অসাধারণ কৃতিত্বগুলি সবিস্তারে জানালে লিঙ্কন বলেন যে তিনি যুবকটিকে অফিসের কাজের জন্য চান, breeding-এর জন্য নয়। মনু রমণীদের সম্পর্কে বলেছিলেন—

'প্রজননার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ'

সুতরাং পাত্রী যখন প্রধানত breeding-এর জন্য তখন এরূপ বিজ্ঞাপন বোধহয় খুব অপ্রাসঙ্গিক বা অসঙ্গত নয়।

'পাত্রীন ন-ম্যাট্রিকত বে পাত্রীরদ াদাব ড়স রকারিচ াকুরে,দ ুইক াকাখ ্যাতিমান অধ্যাপক, এবং এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো ভাই সম্প্রতি উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশযাত্রা করিয়াছেন।'

আমাদের দেশে বিয়ের ব্যাপারটি এক অধ্যাত্ম-মঙ্গলালোকে উদ্ভাসিত। বিবাহ শব্দটির সঙ্গে অনেক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক তাৎপর্য জড়িত হয়ে আছে। এদেশে বিয়ে নরনারীর সাময়িক ডিভোর্সসাপেক্ষ চুক্তি নয়—দুটি আত্মার আত্মীয়তা, দুটি জীবনের সান্নিধ্য সংসারজীবনে এক মধুর প্রেমের মঙ্গলময় আলেখ্য রচনা করে। দুটি জীবনকে যে সামান্য হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে আবদ্ধ করা হয়, যে ক্ষীণ অঞ্চলপ্রান্তে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয় তা বস্তুতই দুশ্ছেদ্য—সেই অটুট প্রেমঘন বন্ধন দুটি পৃথক্ সত্তাকে একীভূত করে। যা কিছু একের তা তখন পরস্পরের হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যেই বোধহয় মাঝে মাঝে কাগজে বিজ্ঞাপন এভাবে শেষ হয়—

'কন্যার সামান্য দাড়ি-গোঁফ আছে। সুতরাং বর মাকুন্দ হইলেও চলিবে।'

* [প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বের রচনা।—স.স.]

---

594 পৃষ্ঠার পর (সমতটের বই)

18. **গুরু অগণন**/সাধন দাশগুপ্ত—40 টাকা।
19. **আঠারোশ ঊনআশি সাল**/সাধন দাশগুপ্ত—25 টাকা।
20. **আনপড়ের লেখালেখি**/অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত—40 টাকা।
21. **রবীন্দ্রনাথ-শ্যামাপ্রসাদ পত্রালাপ**/ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ—30 টাকা।
22. **সমতট : প্রথম ত্রিশ বছরের সূচি**/মিলি চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা রায়—75 টাকা।
23. **পরিবেশ-কথা**/সম্পাদনা : সাধন দাশগুপ্ত, সুমিতা চক্রবর্তী—150 টাকা।
24. **বংশীধর বাগাল**/অরুণিমা রায়চৌধুরী—15 টাকা।
25. **হ্লাপিচের কাণ্ড**/ইভানা বৃলিচ মাঝুরানিচ/অনুঃ প্রবাল দাশগুপ্ত—50 টাকা।
26. **ঝোড়ো জ্যাকের ডায়েরি**/লুইজি বের্তেল্লি/অনুঃ মালশ্রী দাশগুপ্ত—100 টাকা।
27. **ওয়াওতাপু**/ইয়োঝা হোরভাত/অনুঃ ঐ—75 টাকা।
28. **সূর্যটাকে ছুঁতে চেয়েছিলাম**/তোনে পার্তলিচ/অনুঃ ঐ—75 টাকা।
29. **'Forbidden' land of Investment !** / Sourabh Dattagupta–Rs. 18/-

আমার বই পড়া—আমার মনের বই-তরণি
নতুন বিভাগের ভূমিকা

আমাদের এই নতুন বিভাগ আঙ্গিক ও প্রথা-প্রকরণের দিক থেকে হয়তো বুক রিভিয়ুর থেকে অনেক দূরের কিছু নয়, কিন্তু এর পরিকল্পনার পিছনে আছে পাঠকের দিক থেকে অনেকটা বেশি প্রত্যাশা; পাঠকের পাঠাভ্যাসকে আরও বিস্তৃত করে তুলতে সাহায্য করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। একটা ভালো বইয়ের গুরুত্ব অনেক সময়ই বিষয়টা সম্বন্ধে সম্যক জানার সুযোগ না থাকলে পুরোপুরি অনুধাবন করা যায় না, বিশেষ করে ঐতিহাসিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা কাহিনী বা প্রবন্ধমূলক বইয়ের ক্ষেত্রে তো বটেই। এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত লেখাটি নানা আঙ্গিক অবলম্বন করতে পারে : একটি বইয়ের বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে জায়গা মতো আরও নানা বইয়ের উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকতে পারে, কোনও বিশেষ একটিতে ফোকাস না করে লেখাও হতে পারে। যাঁরা একটা পরিকল্পনামাফিক পড়াশুনা করে গভীরতর ধারণা অর্জন করতে উৎসাহী, মুখ্যত তাঁদের জন্য হলেও অন্য পাঠকদেরও এই নতুন বিভাগ কেমন লাগে, জানতে আমরা আগ্রহী।

সম্পাদক, সমতট

সমতটের 'বই-তরণি' বিভাগের
প্রথম নাইয়া / অভিজিৎ মুখার্জি
দ্বিতীয় নাইয়া/মীনা দাঁ

মীনা দাঁ

যুদ্ধ ও উলুখড়ের ছেলেবেলা

রোমান দোবশিনস্কির বোনা এস্পেরো : ইদেয়ালো কাই রেয়ালো (বোনা এস্পেরো : আদর্শ ও বাস্তব) বইটি কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা, এস্পেরান্তো ভাষায়। বইটি জুড়ে আছে রোমানের সঙ্গে প্রধানত উরসুলা গ্রাত্তাপালিয়ার কথোপকথন। এই বইয়ের মিলিতোই কাই ফিয়েল প্লু? (যুদ্ধ বিগ্রহ কীত্যাদি?) অধ্যায়ে ফুটে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলোতে জীবন কীরকম ছিল তারই বাস্তব ছবি। অনুবাদে তারই বর্ণনা।*

রোমান ঃ উরসুলা তুমি কি কখনো ইহুদিদের মুখে থুতু দিয়েছো?

উরসুলা ঃ না, আমি তা করিনি। কেন জিগেস করছো?

রোঃ একবার তুমি বলেছিলে যে একসময় তোমার মনে হতো তোমার এই কাজ করার অধিকার আছে।

উঃ ঠিকই, আমি যখন ওয়ানে পড়ি, ছ'বছরের, তখন আমাদের মাস্টারমশাই, আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে আমরা ইহুদিদের মুখে থুতু দিতেই পারি কারণ ওরা অমানুষ, আমাদের মতো মহামানব নয়। আরও শিখিয়েছিলেন যে আমরা জার্মান বাচ্চারা যেন উল্টো দিক থেকে আসা ইহুদিদের জন্যে রাস্তা না ছাড়ি, ওদেরই রাস্তা ছেড়ে গাড়ির রাস্তায় নেমে যেতে হবে, কারণ ফুটপাথ মহামানব জার্মানদের জন্যে। তখন আমি ডান হাত সোজা সামনে দিকে তুলে 'হাইল হিটলার'[1] বলতে শিখি। সেভাবেই রোজ সকালে মাকেও হ্যালো বলতাম। অনেক পরে জেনেছি মা আমাকে বারণ করতেন না কারণ তিনি ভয় পেতেন যে বারণ করলে আমি সরল মনে কবে কাকে সে গল্প করে ফেলব আর আমাদের নাৎসি বাহিনী মাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করবে। আমাদের মাস্টারমশাই বারবার বলতেন—তোমাদের বাবা বা মা আমাদের ফ্যুরারকে ভালো না বাসলে অবশ্যই আমাদের তা জানিও।

রোঃ ইহুদিদের সম্বন্ধে কী জানতে?

উঃ একবার মার সঙ্গে রুটি কিনতে গিয়ে দেখি আমাদের রুটিওলার বাড়ি জ্বলছে আর সে মাথা চাপড়াচ্ছে। এটা ঘটেছিল 1938-এর শরতে, বার্লিনে। শুনেছিলাম সে ইহুদি বলে তার বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল। অনেক বছর পরে আমি কাচ ভাঙার রাতের[2] সঙ্গে এই ঘটনাটিকে মেলাতে পারি। কিছুদিন ধরেই পথঘাটে কিছু মানুষ দেখতাম যাদের পোশাকে হলদে রঙের তারা আঁকা থাকত। দুটো ত্রিভুজকে ওপর ওপর জুড়ে এই তারার

---

* *বোনা এস্পেরো, গুড হোপ/উত্তম আশা, ব্রাজিলের গোইয়াস রাজ্যের আলতো প্যারাইসো শহরের একটি এস্পেরান্তো মাধ্যম আবাসিক সংগঠন যেখানে প্রধানত সঙ্গতিহীন বাচ্চারাই থাকে, শিক্ষালাভ করে। সংগঠনটি ওই এলাকার অধিবাসীদের সামগ্রিক উন্নতির কাজেও নিয়োজিত।*

নকশা তৈরি—এটা আবিষ্কার করে ব্যাপারটা নিয়ে আমার কৌতূহল জেগেছিল। তারপর আমার চোখের সামনে থেকে, ক্রমশ মন থেকেও ইহুদিরা মুছে গেল। যুদ্ধ যখন থামলো আমি তখন বারো বছরের। এর কিছু পরে আমি বুখেনওয়াল্টের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের কথা পড়ি। আমার শরীর-মন কেঁপে ওঠে। অমানুষদের মুখে থুতু দেওয়ার যে বীভৎস অধিকার মহামানবদের দেওয়া হয়েছিল সেটাও তখন আমার বোধগম্য হয়।

রোঃ ''মানুষকে ঘাতকে পরিণত করার প্রক্রিয়াটা মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে এমন ভাবে ঘটত যে সে তার শিকারের মধ্যে কোনো মনুষ্যত্বই দেখতে পেত না, বরং তাকে শুধুই ইঁদুরের মতো অনিষ্টকর পশু বলে গণ্য করত যাকে এখনই ঝাড়ে বংশে শেষ করা দরকার।"—এই ধারণা সম্বন্ধে তুমি কী ভাব?

উঃ অমানুষদের মুখে থুতু দেবার অধিকার শিক্ষা দিয়ে মগজ ধোলাই প্রক্রিয়া শুরু হত। এক বিজ্ঞানী যিনি ওয়ারসর গেটোতে দুবছর কাটিয়েছিলেন তিনি নানান বিষয়ের মধ্যে এই রকম একটা বর্ণনা দিয়েছিলেন—প্রথমে একটি সৈন্য যে ইহুদিটাকে তার সমানে টুপি খুলে তাকে 'মহামানবোচিত' সম্মান দেখাতে ভুলে যেত সেই ইহুদিটাকে গুলি করত। আবার অন্য সময়ে সে সৈন্যটিই যে ইহুদিটি টুপি খুলছে তাকেও গুলি করত, কারণ তার হিসেবে ইহুদিদের ফ্যুরারের লোকজনকে সম্মান দেখানোর আর কোনো যোগ্যতাই নেই। আমি এটা পড়েছি 'লা জামেনহোফস্ত্রোতো' বইতে। এটা পড়ে আমি এটাকে পর্তুগিজ ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করি। তবে আরও আগে পড়া অন্য অনেক বইও আমাকে যুদ্ধের বীভৎস দিকটা জানতে সাহায্য করেছে।

রোঃ 1939-এর 1 সেপ্টেম্বর যখন নাৎসি জার্মানি পোল্যান্ড দখল করল তখন তুমি ছ'বছরের। তোমার স্মৃতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্ব কিরকম ছাপ ফেলেছিল?

উঃঅ ামিঅ ামাদেরব র্লিনেরব াড়িরস ুন্দরব াগানেদ াঁড়িয়েছিলাম,হ াতেগ ্যাসমাস্ক, নিজেকে বশনি রাপদভ াবছি,অ াকাশেরদি কেত াকাচ্ছিঅ ারঅ ধৈর্যহ য়েজি গেস করছি—ও মা, কেন বোমা পড়ছে না? লোকে বলাবলি করছে যুদ্ধের কথা, বোমার কথা, শত্রুবিমান থেকে বোমা পড়বে। অন্য লোকজনের সঙ্গে আমিও অনেক বারই ছুটোছুটি করেছি নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। আসলে এটা বেশ একটা খেলা ছিল, আর ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেও নি। আমাদের বাড়ির কাছেই সৈন্যরা বিমানধ্বংসী কামান পাহারা দিত। আমি রোজই তাদের সঙ্গে গল্প করতাম আর চকোলেট পেতাম।

রোঃ এই সময়েই জার্মানির বিমানগুলো ওয়ারসর আকাশে হাজির হয়েছিল। আমি তখন এতই বাচ্চা যে কিছুই মনে নেই। তবে জেনেছি আমার মা ও বড় ভাই তাদেওর কাছে গল্প শুনে। ও জানলায় দাঁড়িয়ে শিশুর কৌতূহল নিয়ে তাড়া করে নিচে নেমে আসা বিমানটি লক্ষ করছিল। মা এক ঝটকায় ওকে টেনে নিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়েন, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ওদের ওপর ভাঙা কাচ ছড়িয়ে পড়ে, কারণ পাইলট মেশিনগান থেকে আমাদের জানলায় গুলি ছুঁড়েছিল। পরে ওয়ারস বোমায় বোমায় নাস্তানাবুদ হয়েছে।

উঃ রোমান, তোমরা বাঁচলে কী করে?

রোঃ আমার মা আমাকে কোলে নিয়ে আর পাঁচ বছরের তাদেওকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বোমা বিধ্বস্ত জ্বলন্ত এলাকা থেকে ছুটে পালিয়ে গেছিলেন। আমরা তিনজনে যখন শহরের বাইরে পৌঁছেছি তখন আমাদের কয়েক মিটার সামনেই বোমা পড়েছে। তাতে মাটি ফেটে ছিটকে আসায় আমি আর মা প্রায় ঢাকা পড়ে যাই। কিন্তু দাদা পিছনে থাকায় ঢাকা পড়েনি। ও-ই নিজের হাতে মাকে বের হতে সাহায্য করে। মা আমাদের দুজনকে নিয়ে আরও অনেকে যারা পালাচ্ছিল তাদের দলের সঙ্গেই পূর্বদিকে গিয়ে গিয়ে ক'দিন পর নিজে যে গ্রামে জন্মেছিলেন সেখানে পৌঁছোন।

উঃ খুব শীঘ্রই আমাদেরও বার্লিনে বোমা পড়ার অভিজ্ঞতা হলো, নিজের চোখেই ক'টা ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি দেখতে পেলাম। তখন আমরা প্রায় সব সময়েই শক্তপোক্ত বাংকারে ঘুমোতাম।

রোঃ সেটা সম্ভবত জার্মানি ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে আক্রমণ করার পরে ঘটেছিল। বোমা নিশ্চিতভাবেই ব্রিটেনের। আসলে ওগুলো তো আরও আগেই পড়বার কথা। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সঙ্গে পোল্যান্ডের পারস্পরিক প্রতিরক্ষার চুক্তি ছিল। হিটলার হিসেব কষলেন যে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো পোল্যান্ড দখল অনুমোদন করবে। বাস্তবে হলোও তাই।

উঃ ব্রিটেন আর ফ্রান্স যথাক্রমে 1939-এর 3 ও 4 সেপ্টেম্বর জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তৎক্ষণাৎ পোল-জার্মানদের সংঘাতটা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হল।

রোঃ আর সেই সময়ে জার্মানির শহরগুলোয় বোমা পড়া ছিল সত্যিই ভয়াবহ। উরসুলা, সম্ভবত সেই কারণেই তোমরা বাংকারে আশ্রয় নেওয়া অভ্যেস করেছিলে। তবে হিটলারের হিসেবই ঠিক ছিল, ওই খাতা-কলমে ঘোষণাদি ছাড়া আর কোনো সাহায্য পোল্যান্ড পায়নি, ফলে একাই হেরে গেল। এটা একটা ঐতিহাসিক ভ্রান্তি। কারণ এক বছর পরেই ফ্রান্স প্রায় বিনা বাধায় নাৎসি জার্মানির নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। ব্রিটেনও আক্রান্ত, তাকে একই সঙ্গে নিজের রাজ্য রক্ষা ও জার্মানিকে আক্রমণ করা—দু'কাজের জন্যে রক্তে-ঘামে অনেক মূল্য দিতে হল। যত দূর মনে হয় তখন থেকেই তোমাদের বোমা-পড়ার আসল ভোগান্তির শুরু।

উঃ হ্যাঁ, ঘনঘন বোমা পড়ত। তবে একসময় মনে হল আমার অবস্থাটা অন্যদের চেয়ে ভালো। 1942-এর শুরুতে আমি তো সুবিধে ভোগ করতাম। আমাকে ও আমার ছোটো ভাই ওটোকে সেই বাচ্চাদের দলে ফেলা হয়েছিল যাদের রোজ সন্ধ্যেবেলায় বাসে করে বিশাল সরকারি প্রাসাদে, যেখানে অ্যাডল্ফ হিটলারের নিজের অফিস, সেখানে নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে বিশাল আন্ডারগ্রাউন্ড শোবার ঘরে সারি সারি অগুন্তি বাংকের মতো খাট। সেখানে আমরা নিরাপদে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারতাম। আমাদের বলা হতো—ফ্যুরার তোমাদের সবাইকে চুমু দিচ্ছেন, তিনি ভালো বাচ্চাদের ভালোবাসেন। কী সৌভাগ্য, আমি তো ভালো বাচ্চাই ছিলাম।

রোঃ উরসুলা, তুমি নিশ্চয়ই জানতে না যে ঠিক সেই সময়েই ওয়ারসর গেটোতে দলে দলে বাচ্চারা মারা যাচ্ছে।

উঃ একটা বই থেকে জেনেছি যে যখন আমি হিটলারের দুর্গে তাঁর চুমুর প্রত্যাশা করছিলাম, তখন পোল্যান্ডের অধিকৃত অঞ্চলে আমার সববয়সীরাই হিটলার-তন্ত্রের বলি

হচ্ছিল সবচেয়ে বেশি। ওয়ারসর গেটোতে তারা শুধু বলিই নয়, নায়কও হয়ে উঠছিল। বহুদূর, এমনকি বার্লিন থেকে তাড়িয়ে এনে গেটোতে পুরে দেওয়া পরিবারগুলোর জীবনধারণের কোনো রাস্তা খোলা ছিল না। এসব পরিবারের বাচ্চাগুলোই ছিল অন্নসংস্থানের একমাত্র উপায়। বাচ্চাদের বাধ্যবাধকতা ছিল না ডেভিডের ছ'কোনা তারার ব্যাজ পরার।ফ লেত ।রাখ ।বারেরে খাঁজে পাঁচিলে পরিয়েল ুকিয়ে' আর্যএ লাকা'য় পালাতে পারত। তারা যখন কটা আলু, ক'টুকরো রুটি, ছোট্ট থলেতে ময়দা জোগাড় করে আবার লুকিয়ে গেটোতে ঢুকতে চেষ্টা করত তখন প্রায়শই ধরা পড়ত ও অকুস্থলেই অপরাধীরম তোম ।রা পড়ত।ক ।রণবি নাঅ নুমতিতেে গটোে থকেে বরোনোছি ল মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। আমি এই রকম খাবার খোঁজার ঘটনার, জার্মানরা যাকে চোরাচালান আখ্যা দিয়েছিল, আরেকটি হৃদয়স্পর্শী গল্প পড়েছি। একটি মেয়ে এইরকম চোরাচালানের বামাল সমেত ধরা পড়ে খুব কান্নাকাটি করে প্রহরীর করুণা ভিক্ষার চেষ্টা করেছিল। প্রহরী তার অনুরোধে তাকে প্রাণে না মেরে শুধু তার দু হাঁটুতে গুলি করে নিশ্চিত করেছিল মেয়েটি যাতে আর কখনো এভাবে বেরোতে না পারে।

রোঃ 1943-এর এপ্রিলে ওয়ারসতে কোনো দেওয়ালই ছিল না, কারণ যাদের জন্য দেওয়াল গাঁথার দরকার তারা কেউই আর বেঁচে ছিল না। এক সপ্তাহের নৈরাশ্যজনক বিদ্রোহের পর গেটোটাকে এমনই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল যে ওটা একটা বিশাল স্তূপে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য তখন বার্লিনবাসীদেরও আসল যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হচ্ছিল, তাই না?

উঃ বোমা শুধু রাতেই নয়, দিনেও পড়ত। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময়ে প্রায়ই আমাকে রাস্তার বাংকারে নিরাপদ আশ্রয় নিতে হত। হঠাৎ আমরা জানলাম যে আমার মা পাঁচটা বাচ্চাসমেত চালান হয়ে যাবেন পোল্যান্ডের অধিকৃত অঞ্চলে। আমার মনে আছে, মা যেতে রাজি ছিলেন না, কিন্তু বাধ্যতামূলক মিলিটারি আদেশে যেতেই হয়েছিল। এটা ঘটেছিল 1943-র জুলাইয়ের মাঝামাঝি। ভোরবেলা আমরা হাজির হলাম বার্লিন-নিউকলোন স্টেশনে আর প্রায় রাত অবধি অপেক্ষা করতে থাকলাম। আমার তিন বছর বয়সী যমজ ভাইদুটো সাদা ধপধপে পরিপাটি পোশাকআশাক পরে আমাদের নজর এড়িয়ে চুপিচুপি সামনেই রেলের কয়লার স্তূপে খেলা করতে লাগল। ভাবো, কেমন নোংরা হল ওরা। আমরা সারারাত শিশু ও মহিলা ঠাসা ট্রেনে করে গেলাম ও সকালে ইনভ্রৎসোয়াফ নামে শহরে পৌঁছোলাম। সেখান থেকে বিভিন্ন যাত্রীকে রকম রকম গাড়িতে নানান দিকে পাঠানো হল। আমাদের পরিবারকে বসানো হল একটা ঘোড়ারগাড়িতে। সেটা আমাদের প্রথমে নিয়ে গেল ছোট শহর স্ত্রেলনোতে ও পরে চেনচিস্কো গ্রামে।

রোঃ খুব চিত্তকর্ষক জায়গা। পোল্যান্ডের জন্মভূমি। তাহলে তোমরা পোল রাজত্বের প্রথম ঐতিহাসিক রাজধানী গ্নিয়েজনোর কাছাকাছি থেকেছিলে। ওইখানে ঠিক 1000 সালে জার্মান সম্রাট তৃতীয় ওটো পোলীয় রাজা বোলেসলাও লা ব্রাভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ওঁরা বন্ধু ছিলেন।

সালে জার্মান সম্রাট তৃতীয় ওটো পোলীয় রাজা বোলেসলাও লা ব্রাভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ওঁরা বন্ধু ছিলেন।

উঃ পোল্যান্ডে চালান হওয়া জার্মান যুবসম্প্রদায়ের সম্মেলনের সময়ে আমি গ্লিয়েজনোয় গেছি। ওই প্রথম আমি ওরকম নাৎসি-প্রোপাগান্ডা-সর্বস্ব রাজনৈতিক সমাবেশে যোগ দিই। আমার মনে পড়ছে হিটলারের বাগ্মিতার ধরন অনুকরণ করে নাৎসি আয়োজকের গাঁকগাঁক করে বক্তৃতা দেওয়া। বক্তা ছিলেন অধিকৃত পোল্যান্ডের ওই অংশের শাসক।

রোঃ একটু বিশদে বলতে দাও। 1939-এর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পোলীয় সৈন্যবাহিনী আত্মরক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবার জন্যে দেশের পূর্বাঞ্চলে নিজেদের শক্তি ঢেলে সাজায়। আর 17 সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যান্ড আক্রমণ করে। রাশিয়ানরা তড়িঘড়ি দেশের পূর্বাঞ্চল দখল করে নেয়, আর জার্মানরা তো তখন পশ্চিমাঞ্চল দখল করেই ছিল। দেখা গেল যে জার্মানি-সোভিয়েত ইউনিয়নের এই আগ্রাসন তাদের পারস্পরিক কুখ্যাত রিবেনট্রোপ-মোলোতোভ চুক্তি সমর্থিত।

উঃ সত্যি বলতে কী আমি জানতামই না যে অধিকৃত পোল্যান্ডের যে অংশে আমাদের চালান করা হয়েছিল সেটা পোল্যান্ডের পশ্চিমাঞ্চল।

রোঃ জার্মানি অধিকৃত পোল্যান্ডের কেন্দ্রীয় অঞ্চল, যাকে লোকে জেনেরাল গভর্নমেন্ট বলত, তার অন্তর্ভুক্ত ছিল ওয়ারস ও ক্রাকুফ। আর পোজনান শহরসহ পশ্চিমভাগকে নাৎসিবাহিনী 'নতুন জনবসতি' হিসেবে এবং কালক্ষেপ না করে পুরো অঞ্চলটার ভোল বদলে পুরো 'জার্মানি' বানিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে ওয়ার্থেগাউ নাম দিয়ে সরাসরি জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। তোমার পরিবারকে সেখানেই পাঠানো হয়েছিল। নতুন জনবসতির অঞ্চলটা তোমাদের কেমন লাগল?

উঃ অঞ্চলটা ছিল চেনচিস্কো গ্রাম। সেখানে দশটা জার্মান ও তার তিনগুণ বেশি পোলীয় পরিবার বাস করত। সকলেই কৃষিজীবী, কারুরই বিশাল জমি-জায়গা ছিল না। ওই জার্মানরা বহুদিন ধরেই ওখানকার বাসিন্দা, ওরা পোল ভাষা বলত, পোলীয়রাও জার্মান জানত। আমার হিসেব মতো ওরা পরস্পরের পুরোনো প্রতিবেশী হয়ে সম্প্রীতির সঙ্গেই বসবাস করত।

রোঃ ওয়ার্থেগাউর অংশ হিসেবে গ্রামটার নিশ্চয়ই একটা জার্মান নামও দেওয়া হয়েছিল।

উঃহ্যাঁ,ও টারস রকারিন ামছি লড য়েটেশরোডে ান তুনব সতিন য়,অ ামরাও টাকে নির্বাসন মনে করতাম। শুরুতেই অশান্তির সূত্রপাত। আমাদের ভাগাভাগি করে কয়েকটা জার্মান পরিবারের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল—তারাই আমাদের রাখবে, খাওয়াবে, দেখভাল করবে। মার সঙ্গে রইল শুধু সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটা। মনে আছে, মা আমাদের পরিবারকে এভাবে ভেঙে টুকরো করে দেওয়ার জন্যে প্রতিবাদ করেছিলেন, হিটলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন।

রোঃ ওঁর ভয় করেনি?

উঃ ওরা প্রচুর ভয় দেখাতো, যার মধ্যে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের ভয়ও ছিল, মা তখনকার মতো সাবধান হয়েছিলেন। এক সপ্তাহ আমরা এইরকম আলাদা রইলাম। শেষে একটা

পোলীয় স্কুলের দুটো ঘরের একটাতে আমাদের সকলকে একসঙ্গে রাখা হল। স্নানের ঘর ইত্যাদি বাইরে। পোলীয় বাচ্চাদের দুটো ঘর দরকার হত না। কারণ তারা ক্লাস ফোর অবধি সকলে একসঙ্গে বসে লেখাপড়া শিখত। কেন ক্লাস ফোর অবধি সেটা আমি জেনেছি অনেক পরে। আগে থেকেই ছক কষা ছিল যে ওয়ার্থেগাউয়ের 'হিটলারি-হিসেবে-বাঁচার-অধিকারী-জনগোষ্ঠী'র পোলীয়ত্ব নির্মূল করে তাদের বিশুদ্ধ জার্মান আদব-কায়দা শিখিয়ে 'মনুষ্যপদবাচ্য' করে নেওয়া হবে। লক্ষ্যে ছিল সেই পোলীয়রা যারা জাত ও রাজনীতির বিচারে 'মানুষ' হবার যোগ্য। বাদবাকিদের জার্মানভাষায় পড়াশোনা করার কথা হলেও বাস্তবে তাদের শুধুমাত্র খুব প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান অর্জনের অধিকার ছিল যাতে তারা আদেশনামা বুঝতে পারে, একশ অবধি গুণতে পারেঅ ার পথনির্দেশ পড়তে পারে।অ ামাকে পোলীয়স মবয়সীদেরস ঙ্গে খলতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু আমার শিশু স্বভাব সরকারি নির্দেশনামার চেয়েও বেশি কড়া ছিল, তাই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের সঙ্গে খেলতাম। এখনো আমার একটু একটু পোল ভাষার কিছু কিছু কথা মনে আছে।

রোঃ জার্মান বাচ্চাদের স্কুল কোথায় ছিল?

উঃ স্ত্রেলনোতে, চেনচিস্কো থেকে ছ'কিলোমিটার দূরে। আমার ছ'বছরের ভাই ওটোকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে রোজ বারো কিলোমিটার হাঁটতে হোতো। শীতকালে ভোরের অন্ধকার থাকতে থাকতেই আমরা বেরিয়ে পড়তাম। তখন ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা, তাপমাত্রা শূন্যের দু ডিগ্রি নিচে, আর ঘন বরফ। মা আমাদের কম্বল দিয়ে মুড়ে দিতেন। রাস্তার অর্ধেকটাই ছিল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সেখান দিয়ে যাবার সময়ে ভয়ে আমাদের লোম খাড়া হয়ে যেত। মাঝে মধ্যেই বিশাল কালো বুনো ভালুক দেখা যেত। আমরা তখন দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়তে গিয়ে বরফে হোঁচট খেয়ে আছাড় খেতাম। একবার তো ছোট্ট ওটোর আর শক্তিতে কুলোয় নি, সে রাস্তাতেই বসে পড়েছিল। তখন মা সাহায্য করার জন্য ছুটেছিলেন আর পিঠে করে ওকে নিয়ে এসেছিলেন।

রোঃ ওই গ্রামে আর কোনো জার্মান বাচ্চা ছিল?

উঃ হ্যাঁ, ওদের মা-বাবারা ওদের ঘোড়ার গাড়ি করে স্ত্রেলনোতে পৌঁছোতেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে নিতে চাইতেন না। লোকে আমাদের 'উড়ে এসে জুড়ে বসেছে' বলে মনে করত। মা স্কুলে গিয়ে ঝামেলা করেছিলেন। তারপর একজন জার্মান কৃষক যে তার বাচ্চাদের ঘোড়ারগাড়িতে স্কুলে নিয়ে যেত তাকে বাধ্য করা হয়েছিল আমাদেরও সঙ্গে নিতে। গাড়িটা ঠাসা ভর্তি হত, আটটা বাচ্চা বসত তাতে। ঘোড়া দুটো বরফের রাস্তায় পিছলে পিছলে যেত, দেখে আমার কষ্ট হত। যুদ্ধ থামার পরে আমি জেনেছিলাম যে সেবারম াকেক নসেন্ট্রেশনক ্যাম্পেন া পাঠানোরক ারণে তমনছি লন া।অ ামাদের যাতায়াত নিয়ে ঝামেলা করে মা আবারও নাৎসি শাসনব্যবস্থাকে অপমান করে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। মা বাবাকে খবর দিতে পেরেছিলেন। বাবা 1943-এ নাৎসি পার্টিতে যোগ দেন। ওই নাৎসি পার্টির ক্ষমতার জোরেই মাকে বাঁচান।

রোঃ তোমার বাবা কি করতেন?

উঃ বাবা পেশায় ছিলেন ফার্মাসিস্ট। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে উনি ছিলেন রেলের কর্মী ও সৈন্য যোগান দিতেন। পূর্বদিকের ফ্রন্টগুলোতে, এমন কি স্তালিনগ্রাদেও, উনি পরিবহনের পরিচালনা করতেন।

রোঃ ওঁর উদ্যোগেই কি তোমাদের পরিবারকে বার্লিন থেকে দূরে ওই নিরাপদ অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল ?

উঃ মোটেও না। ওঁর তো সর্বক্ষণের চিন্তা ছিল কী করে আমাদের আবার বাড়িতে ফিরিয়ে আনা যায়। এই চালান করার সঠিক কারণটা আমি যুদ্ধের কয়েক বছর পর শোনা 'লেবেনসবোর্ন' কথাটার সঙ্গে জুড়ে বুঝতে পারলাম। কথাটার অর্থ 'প্রাণের উৎস'। কথাটার মধ্যে লুকিয়ে আছে নাৎসিদের শ্রেষ্ঠ জাতকে রক্ষার পরিকল্পনা। এটার মূল উদ্দেশ্য 'বিশুদ্ধ আর্য' বংশবৃদ্ধি, ঠিক যেমন করে উঁচু জাতের গাভী প্রজনন করা হয়। আমার ছিল সোনালি চুল, নীল চোখ আর লম্বা লম্বা পা।

রোঃ হিটলারের বাংকারে ঘুমোনোর জন্যে যে বাচ্চাগুলোকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তারাও কি ঠিক তোমার মতই ছিল ?

উঃ একদম, তাই তো তাদের জন্য এই বিশেষ নিরাপত্তা। দামী জিনিসের মতো, আসলে বিশুদ্ধ আর্য সৈনিক প্রজননের যন্ত্র হিসেবে, আমদের আগলে রাখা হত, যাতে আমাদের কোনো বিপদ না হয়। কয়েক বছর পরে এটা জেনে আমার মনে খুব কষ্ট হয়েছিল যে যখন অবোধ শিশু ছিলাম তখনই আমাকে 'উৎস' বলে বেছে নিয়ে জাতিতত্ত্বের বর্বর মাপকাঠির উৎকৃষ্ট প্রান্তে রাখা হয়েছিল। তার বিপরীত নিকৃষ্ট প্রান্তের মানুষদের বর্ণবিদ্বেষী নাৎসিরা নাম দিয়েছিল 'নিধন সমাধান'।

রোঃ যখন ন'বছরের উরসুলা হিটলারের বাংকারে 'জীবনের' নিরাপত্তায় ঘুমোচ্ছে তখন জামেনহফের নাতি চোদ্দ বছরের লুদোভিককে 'মরণের' নামে ওয়ারসর গেটোতে চালান করে দেওয়া হয়েছে।

উঃ কিন্তু নাৎসি শাসন তো নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে শুধুই মরণের উৎস, লুদোভিকের জন্যে মরণ, এবং অবস্থাগতিকে আমার জন্যেও। যখন 2000 সালে ডক্টর লুদোভিক জালেস্কি-জামেনহফ বোনা এস্পেরো-এ এসেছিলেন তখন আমরা এ নিয়ে একান্তে কথা বলেছি। জার্মানির নাৎসি শাসন অন্য জাতের পাহাড়প্রমাণ মৃতদেহের ওপরে আমার, বিশুদ্ধ আর্য জার্মান শিশুর, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। বিস্ময়জনক এটাই যে উনি নিজের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন, তবে আমাকেও শেষ অবধি মৃত্যুসংকট থেকে পালাবার পথ খুঁজতে হয়েছিল।

রোঃ তবে তো মনে হচ্ছে যেখানে তোমাদের চালান করা হয়েছিল সেটা পোলীয় গ্রাম নয়।য ুদ্ধেরদ স্তুরটাছি লঅ ধিকৃতঅ ঞ্চলেবি জেতাৈ সন্যবাহিনীর পরেইে পৌঁছোবে সিভিলিয়ান অফিসাররা, এমনকি বিশেষ পুলিশবাহিনীও। উদ্দেশ্য ওই অঞ্চলে জার্মান প্রশাসনের পরিকাঠামো গড়ে তোলা, তবে সর্বাগ্রে অঞ্চলগুলোকে জার্মানির শত্রুমুক্ত করে 'পরিশুদ্ধ' করে নেওয়া।

উঃ আমার মনে আছে, মা আমাকে খেয়াল করিয়ে দিতেন যে স্কুলে যাবার সময়ে আমরা যেন কখনোই পাশের জঙ্গলে না ঢুকে পড়ি। মাঝে মাঝে সেখান থেকে গুলির শব্দ শোনা যেত আর মাংসপোড়ার বিদঘুটে গন্ধ পাওয়া যেত। পোলীয় নিধন নিয়ে ফিসফাস শুনতে পেতাম। 2003 সালে এস্পেরান্তোভাষী জর্জ হান্সলিক আমাকে ওখানে নিয়ে গেছিলেন। আমাদের পরিবার 1944 সালে যেখানে বাস করত সেই স্কুলটা আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। দরজায় একটি যুবক দাঁড়িয়েছিল। আমি কে তা জানতে পারা মাত্র সে আর তার বাবা-মা যে ঘরে আমরা থাকতাম সেই ঘরে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করল। পুরোনো সেই টালির উনুন, যেটা তখন আমাদের উষ্ণ রাখত, সেটাকে দেখে আমার মন ভীষণ আবেগচঞ্চল হয়ে উঠল। আমরা টেবিলে বসে কফি, কেক ইত্যাদি খেলাম, আন্তরিকভাবে গল্প করলাম। এস্পেরান্তো ছিল আমাদের সেতুভাষা। এছাড়াও গৃহস্বামী আমাকে এক বৃদ্ধার কাছে নিয়ে গেলেন যিনি আমাদের পরিবারের কথা মনে করতে পারলেন। আমরা সেই জঙ্গলেও গেছিলাম, সেখানে গিয়ে ভয়ে আমার হাত-পা হিম হয়ে গেল। ষাট বছর বাদেও গাছের গায়ে বুলেটের চিহ্ন! দেখলাম স্মৃতিসৌধ, তার গায়ে খোদাই করা তখন যাদের হত্যা করা হয়েছিল সেই পোলীয়দের নামের দীর্ঘ তালিকা। স্ত্রেলনোর স্কুলটা শুধুমাত্র জার্মান বাচ্চাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেবার আগে পর্যন্ত যিনি স্কুলের ডিরেক্টর ছিলেন সেই পোলীয় ডিরেক্টরের নামটাও তার মধ্যে আমাকে একজন দেখালো। আমি চেনচিস্কোর সাবেক বাসিন্দা জার্মানদের কথা জিগেস করলাম। উত্তর না দিয়ে আমাদের গৃহস্বামী শুধু হাত দিয়ে নিজের ঘাড় স্পর্শ করলেন। মুণ্ডু উড়িয়ে দেওয়ার ওই ভঙ্গিই স্পষ্ট বলে দিল যে অধিকৃত ওই 'নতুন জনবসতি' থেকে পালিয়ে না গেলে আমাদেরও কী দশা হতো।

রোঃ তোমরা ওখান থেকে পালালে কী করে?

উঃ 1944-এর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আমাদের বাবা হঠাৎই একদিন চেনচিস্কোতে হাজির হলেন। তখন অন্ধকার। আমরা ঝটিতি তৈরি হয়ে যে ঘোড়ারগাড়িতে বাবা এসেছিলেন সেটাতে চড়ে বসলাম। কাউকে বিদায় না জানিয়ে আমরা মোগিলনোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে পোজনান। বাবা ওয়ারস থেকে সোজা আমাদের কাছে এসেছিলেন। ট্রেনে উনি মার সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছিলেন। মার মুখভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছিল কোনো আতঙ্কজনক কথাবার্তা চলছে।

রোঃ 1944-এর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আমার বাবা ওয়ারসতে নিখাদ নরক দেখতে পেয়েছিলেন। 1 আগস্ট থেকে জার্মানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। ওয়ারসর বাসিন্দারা কোনো রকম সাহায্য ছাড়াই দু'মাস ধরে লড়াই করেছিল। ওই হতাশাভরা বীরত্বের নজির ছিল জার্মান ট্যাংকের দিকে বোতলে করে পেট্রল ছোঁড়া বাচ্চাগুলো। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে দু'লক্ষ মানুষ মরে আর শহরটাও শেষ হয়ে যায়। জার্মানরা যখন ওয়ারসর লোকেদের মেরে ফেলছিল তখন নদীর ওপারের শহরগুলোতে রুশ সৈন্যরা নির্বিকার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখছিল।

উঃ লাল সৈন্যবাহিনীর এগিয়ে আসা আর জার্মানির অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের ভাবনায় আমার বাবা বোধহয় আতঙ্কিত হয়েছিলেন। উনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন যুদ্ধের মুখ কিভাবে

ক্রমশ পশ্চিমকে গ্রাস করছে। স্তলিনগ্রাদ থেকে শুরু করে হাজার হাজার কিলোমিটার পেরিয়ে আমাদের ‘নিরাপদ’ আস্তানা থেকে মাত্র দুশো কিলোমিটার দূরে পৌঁছে গেছে। পোজনান আর একটু দূরে। ওটা আবার রণকৌশলের ক্ষেত্রে রেললাইনের একটা সুবিধাজনক মোড়। জার্মান রেলকর্মীরা পোলীয় বাসিন্দাদের তাড়িয়ে ওখানকার সার সার বাড়ি দখল করে নিয়েছিল। বাবা আমাদের জন্যে আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। উনি ফিরলেন খ্রিস্টমাসের সময়ে। কয়েক বছর আলাদা থাকার পর আবার আমরা পরিবারের সকলে মিলে উৎসব পালন করেছিলাম, নিচু গলায় গানও গেয়েছিলাম। আমরা 23 ডিসেম্বর উৎসব করেছিলাম, কারণ বাবা বলেছিলেন, আগামীকাল হয়তো আমরা বেঁচেই থাকবো না।

রোঃ ওয়ারস ধ্বংস হয়ে যাবার পর ভিস্তুলো নদী বরাবর যুদ্ধের গতিটা রুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু 1945-এর জানুয়ারিতে সোভিয়েত বাহিনী নতুন করে আক্রমণ শুরু করে। তোমরা কি তখন পোজনানে?

উঃ বাবা আবার এলেন 25 জানুয়ারি। আমাদের তখুনি গরম জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে নিতে হল, কারণ বাইরে বরফ পড়ছিল। বাবার প্ল্যান খালি হাতে হাঁটতে বেরোনো। শুধু আমাকে আমার প্রিয় বইগুলো একটা পিঠে ঝোলানো ব্যাগে নিয়ে নেবার সম্মতি দিলেন। দেখা গেল, আমাদের এই ‘হাঁটতে বেরোনো’র উদ্দেশ্যটা প্রতিবেশীরা ধরতে পারে নি। আমরা রেলস্টেশনে গেলাম। বাবা ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী, তাদের পরিবারসহ, মতলব করে একটি মাত্র বগি লাগানো একটি ট্রেন বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করলেন। ওই অদ্ভুত ট্রেনে চড়ে সবাই বার্লিনে পৌঁছে বিভিন্ন দিকে চলে গেল। আমরা পরমানন্দে আমাদের বাড়ির দিকে চললাম। কিন্তু সুন্দর বাড়িটার বদলে দেখা গেল শুধু পাহাড় প্রমাণ রাবিশের স্তূপ! বাবা আমাদের কনকনে ঠাণ্ডা, হিটারের ব্যবস্থা নেই, এমন একটা রেস্টুরেন্টে রেখে চলে গেলেন। তারপর চটপট ফিরে এসে আমাদের একটা ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়ির মালিকরা হয় বেঁচে নেই, নয়তো শহর ছেড়ে চলে গেছে। বার্লিনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। তবুও আমরা বাড়ি ফেরার আনন্দ অনুভব করেছিলাম।

রোঃ স্বদেশে ফেরার আরও লম্বা পথের অভিজ্ঞতা হয়েছিল তোমারই বয়সী এক পোলীয় কন্যার। আট বছর ধরে তার দুঃসাহসিক অভিযান চলেছিল। বোনা এস্পেরোর গ্রন্থাগারে আমি ‘তাইগো[3] থেকে মিনারেতো[4]’ নামে একটা বই পেয়েছি যার উৎসর্গপত্রে লেখা আছে ‘প্রিয় উরসুলা। এই হলাম শিশু আমি। আমাকে অনুসরণ কর! আদা’।

উঃ আমাকে অনুসরণ কর!—এই বলে ও আমাকে আহ্বান জানিয়েছিল যাতে আমিও আমার শৈশবের কথা লিখি। আদা ফিগিএরা সিকোর্স্কা আমার বন্ধু ছিল আর ওই ছিল প্রথম মানুষ যে আমাকে জার্মান- হওয়া সত্ত্বেও আমিও যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শিকার ছিলাম—একথা জোর গলায় বলার সাহস যুগিয়েছিল। ওর সৌজন্যেই আমি ভয়ংকর যুদ্ধের অন্য দিকটা চিনেছিলাম। কারণ নাৎসি জার্মানির পোল্যান্ড আগ্রাসনের ফলে তাকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সাংঘাতিক কষ্ট সহ্য করতে হয়। পোল এলাকার পূর্বার্ধ, যেটা১ ৯৩৯-এরে সপ্টেম্বরেঅ ধিকৃত,ে সখানেে সাভিয়েতরাে পালবাহিনীরএ কটা

বিশাল অংশকে, পঁচিশ হাজার অফিসারকে নির্দিষ্ট কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে পুরে দেয়। স্তালিনের বিশেষ আদেশে অনতিবিলম্বে তাদের মৃত্যু হয়। এই পরিকল্পিত গণহত্যার অপরাধ কাতিন[৫] নামে, সবচেয়ে বড় নিধনভূমির নামেই পরিচিত। এই গণহত্যায় আদার বাবা জেনারেল ফ্রান্সিশেক সিকোর্স্কিও নিহত হন। আর একই সঙ্গে শুরু হয় অসামরিক পোলীয় জনতাকে সাইবেরিয়া ও বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য দূরবর্তী এলাকায় নির্বাসিত করা। নির্বাসিতদের সংখ্যা প্রায় বিশলাখে ঠেকেছিল। এদের অধিকাংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এগারো বছরের আদা, আমাদের হতভাগ্য প্রজন্মের শিশু, যাকে পাঠানো হয়েছিল কাজাকস্থানে, সে আশ্চর্যভাবে এই নির্মম ইতিহাস পেরিয়েও টিকে থাকে। আদার বইয়ের বর্ণনা মর্মন্তুদ।

রোঃ আচ্ছা, এবার 1945-এর শুরুতে ফেরা যাক। বার্লিন তো তখন পশ্চিম আর পূর্ব দুদিকের ফ্রন্ট থেকে আসা বোমারুবিমানের আওতার মধ্যে। তোমাদের কি বাড়ি ফিরে আফশোস হয়েছিল?

উঃ যদিও তখন আমার পুরো বারো বছরও হয়নি তবুও ওই ক'মাসেই আমি পুরোপুরি বড় হয়ে গেলাম। বাবা কোনোভাবে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। মা ষষ্ঠ বাচ্চার জন্ম দিতে হাসপাতালে ভর্তি। ওই বোমা পড়া আর বাড়িতে বাড়িতে আগুন লেগে যাওয়ার দিনগুলোয় পুরো পরিবারের দায়িত্ব আমার ওপর। আমি পথচারীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলতাম—আগুন নেভাতে সাহায্য কর, কিছু একটা কর। তারা শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে আপন পথে চলে যেত, কারণ বাড়ি তো শুধু একটা জ্বলছে না, অনেকগুলো জ্বলছে। আমার আর বড়দের ওপর ভরসা ছিল না। নেহাৎই সংসারের অনিচ্ছুক-কর্তার মতো দিনের বেলা আমি চার ভাইবোনকে বাচ্চাদের পার্কে নিয়ে যেতাম আর বিকেলে ওদের নিয়ে যেতাম শহরের প্রশাসনভবনের বাংকারে। মা বাচ্চা নিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে এলেন, খুব দুর্বল তিনি। খাবারের অভাব, জলও নেই। আমাদের আসল থাকার জায়গাটা তো এখন আর চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ি নয়, বরং শুধুমাত্র সেটার নিচের বেসমেন্টটুকু, যেখানে আশ্রয় নিয়েছে আরও অনেকে।

রোঃ ভাইবোনদের খাওয়াতে কী?

উঃ আমাদের মা অনেক দিন আগেই এক বস্তা টুকরো টুকরো শুকনো রুটি তৈরি করে রেখেছিলেন। প্রত্যেক বাচ্চাই সকালে এক টুকরো করে সেই রুটি পেতো, মুখের লালায় ভিজিয়ে নরম করে তাই খেতো। এক টুকরোতে বিকেল অবধি চালাতে হতো। শহর অবরুদ্ধ, বোমারুবিমান বোমা ফেলছে, কামানের গোলা ছুটছে। একবার আমি কিছু কাপড়জামা নিয়ে আসার জন্যে ছুটে ওপরে আমাদের ফ্ল্যাটে গেছিলাম। ফ্ল্যাট তো বেশ ভেঙে গেছে বাক্সপ্যাঁটরা চুরমার। দেওয়ালে বড় বড় গর্ত দেখা যাচ্ছে আর খাটের ওপর প্রায় আধমিটার লম্বা অদ্ভুত একটা গোলা পড়ে রয়েছে। আমি তাকে অতি কষ্টে তুলে নিচে নিয়ে এলাম এই ভেবে যে এই ফোকোটের যুদ্ধাস্ত্রটা রুশদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সময়ে আমাদের কাজে লাগবে। অহংকারের সঙ্গেই ঘোষণা করলাম—,এই দেখ বোমা, এখনও আনকোরা। কিন্তু খুশি হওয়ার বদলে সক্কলে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। তারপর গোলাটাকে খুব সাবধানে যতটা সম্ভব দূরে কোথাও ফেলতে নিয়ে যাওয়া হল।

রোঃ তবে শেষ অবধি অবশ্য তোমার গোলাও রুশ বাহিনীকে থামাতে পারেনি।

উঃ আরও আগে, 1945-এর মার্চে, অসামরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সকলকে, এমনকি বাচ্চাদেরও, সামিল করা হয়েছিল, যার নাম জনতার হামলা—জনরোষ। আমাদের কাজ ছিল ব্যারিকেড গড়ে তোলা। রাস্তার মোড়ে সমান্তরাল দুটো দেওয়াল গেঁথে দুইয়ের মাঝখানে যা যা সম্ভব আমরা ঠেসে ঢুকিয়ে দিতাম। যা যা মানে মূলত ফাঁকা ঘরবাড়ির আসবাবপত্র। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এগুলো রাশিয়ান ট্যাংককে থামিয়ে দেবে। লোকে নিত্যই বিশ্বাস করত যে বার্লিন আত্মসমর্পণ করবে না, কারণ মার্শাল ওয়েংকেরব াহিনীক াছাকাছিচ লেইএ সেছেঅ ারশীঘ্রইত ারাশ ক্রুকেপ্রতিআক্রমণ করবে। হিটলার বদ্ধমূল ধারণায় নিজের বাংকারে তেমন করেই বার বার বলছেন—লা পেরেরো সিনেমায় এটা নিখুঁতভাবে দেখানো হয়েছে। সিনেমাটা আমার মনে দ্বিগুণ দাগ কেটেছিল কারণ, প্রথমত, আমি নিজেও যে-সব কর্মকাণ্ডের অংশ ছিলাম সেই সব ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, আর দ্বিতীয়ত, যে জার্মান ঐতিহাসিক ও সাংবাদিকের বই অনুসরণে সিনেমাটা তৈরি করা হয়েছিল সেই ইয়োআখিম ফেস্ট আমার স্কুলের বন্ধু ক্রিস্টার ভাই।

রোঃ রাশিয়ান ট্যাংক কি তোমাদের ওই ব্যারিকেডের সামনে থেমে গেছিল?

উঃ না, ওগুলো আমদের রাস্তার সমান্তরালে যে রাস্তার মুখে ব্যারিকেড ছিল না হুড়মুড়িয়ে সেটাতে ঢুকে গেল। আর ট্যাংকগুলোকে কাছ থেকে দেখামাত্র আমাদের ওই খাটুনির অসারতা আমার বোধগম্য হল। আমরা থাকতাম দক্ষিণের নিউকলোন এলাকায়। ঠিক ওই দিক থেকেই বার্লিনের ওপর হামলা শুরু হল 1945-এর এপ্রিলে। আমাদের বেসমেন্টে প্রায় পঞ্চাশজন জড়ো হয়েছিল। সকলেই আবর্জনা, খিদে, নিরাশা, হতাশার মধ্যে কোনো মতে প্রাণে বেঁচে ছিল। হঠাৎই দরজার ঝনঝন আওয়াজ আর আমাদের চোখগুলো ধাঁধিয়ে গেল টর্চের আলোয়। সৈন্যরা মুখে আলো ফেলে ফেলে মহিলাদের বেছে আলাদা করছে। আমি আমার দুটো হাত মেঝেতে ঘসে নিয়ে সেই নোংরাটা মার মুখে মাখিয়ে দিলাম আর ছোট ভাইগুলোকে চিমটি কাটলাম যাতে ওরা কেঁদে ওঠে। আলোটা এক মুহূর্তের জন্যে কাঁদুনে কাচ্চাবাচ্চা সমেত মার ওপর থামল, তারপর অন্যদিকে ঘুরে গেল।

রোঃ তুমি কি পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরেছিল?

উঃ না, আমি যা করার অবচেতনেই করেছি। তখনকার দিনে আমার মতো বয়সে যৌন প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কারুর কোনো ধারণাই থাকতো না। তবে আমি দেখেছিলাম বিধ্বস্ত অবস্থায় সাংঘাতিক কাঁদতে কাঁদতে মহিলাদের আবার সেই বেসমেন্টে ফিরে আসতে। পরে আমি নিজের চোখেই দেখেছি সৈন্যরা কোনো মহিলাকে ঘিরে ফেলে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে। অবশ্য তখন আমি বয়সের তাৎপর্যটা বুঝিনি। আমার মা তো আতঙ্কে বেসমেন্ট থেকে কখনোই বেরোতেন না, এমনকি পরেও ছ'মাস বাড়ি থেকে বেরোন নি। পরিবারের বাঁচা-মরার দায়িত্ব আমার ওপরেই ছিল। এই দায়িত্বের অর্থ ছিল সবার আগে কিছু খাবার জোগাড় করা। জলও ছিল না, কলে জল আসত না। প্রায় এক কিলোমিটার

দূরে আগুন নেভানোর কাজের জন্য জলের একটা চৌবাচ্চা ছিল। আমি বালতি নিয়ে অতটা পথ গেলাম। রাস্তায় পড়ে থাকা লাশ দেখেও আমার আর কোনো বিকার হল না। তবে আমি জলের ভেতরে লাশ দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছিলাম। কিন্তু তেষ্টাটা ছিল ভয়ের চেয়েও বেশি। আমি জল তুলে আমার রোগা ছোট্ট শরীরের তুলনায় যথেষ্ট ভারি বালতিটা বয়ে নিয়ে এলাম। আমি সত্য গোপন করিনি। তবে বিপদের কথা মাথায় রেখে অনেকক্ষণ ধরে জলটা ফুটিয়েছিলাম। কপাল ভালো যে কোনো অঘটন ঘটেনি। আমরা থাকতাম রেল স্টেশনের কাছেই। রেল লাইনে মাঝেমধ্যে বাড়তি খাবারের টুকরো বা খানিক পচা আলু পাওয়া যেত, যা থেকে বাদসাদ দিয়ে গলাধঃকরণের মতো একটু কিছু পাওয়া সম্ভব হত।

রোঃ শহরে একা ঘোরাফেরা করতে তোমার ভয় করত না?

উঃ ভয় করত, তবে প্রায়ই আমার দিকে বন্দুকের নল উঁচিয়ে রয়েছে—এই ব্যাপারটায় ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম। তখন আমি নিজে নিজেই দু'হাত ওপরে তুলতাম। কয়েকবার তো আমি যেন এই সদাচরণের জন্যেই পুরস্কারও পেয়েছি—এক টুকরো রুটি বা অন্য কোনো খাবার। 1945-এর ৪মে সরকারিভাবে যখন যুদ্ধ শেষ হল রাশিয়ানরা তখন লোকজনদের টাইফয়েডের মতো সংক্রামক রোগ সারাবার ওষুধপত্র দিল, উকুনের মতো পরজীবীর স্বাস্থ্যসম্মত প্রতিকারের ব্যবস্থা করল। তখন স্টেশন ঘিরে রাশি রাশি জার্মান যুদ্ধবন্দীদের জড়ো করা হয়েছে। রাশিয়ানরা তাদের ঠেলেঠুলে সোভিয়েত ইউনিয়নগামী ট্রেনে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। যদি সেই ভিড়ে বাবার দেখা পাই এই আশায় আমি সেই শত শত লোকের মুখ দেখে বেড়াতাম। একবার রান্নাঘরে ঢুকেছি ... দেখি বাবা! সশরীরে বসে রয়েছেন, যদিও আহত। যা ঘটেছিল তা হল ফ্রন্টের সঙ্গে পশ্চাদপসরণের সময়ে বার্লিনের উত্তরে ওঁকে জনরোষে সামিল করা হয়। রাশিয়ানদের হাতে বন্দী হয়ে, সারিবদ্ধভাবে মার্চ করে ট্রেনের দিকে যাওয়ার সময় উনি কোনোভাবে নজর এড়িয়ে পাশ দিয়ে সরে পড়তে সমর্থ হন। তারপর ক'দিন ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে আসেন। তারও আগে উনি 'জনতার হামলা' দলের উগ্রবাদীদের কবল থেকে পালাতে পেরেছিলেন। যারা আর লড়াই করতে চাইত না উগ্রবাদীদের মতে তারা ছিল মৃত্যুদণ্ডযোগ্য 'বিশ্বাসঘাতক'। অনেক আগে থেকেই অত অত লাশ দেখার ফলে আমি যেন হঠাৎ অলৌকিকত্ব অনুভব করলাম। সান্ডখুলার পরিবারের আটজন সদস্যের সকলেই জীবিত অবস্থায় আবার এক জায়গায় মিলিত হয়েছি। আমি জীবনের মূল্য উপলব্ধি করলাম আর সেই মুহূর্ত থেকে প্রতিদিন বেঁচে থাকার উৎসব করি।

রোঃ বার্লিন তো চার বিজেতা শক্তির মধ্যে ভাগ হয়ে গেছিল। তোমাদের শহরাঞ্চলটা কার ভাগে পড়েছিল?

উঃ রাশিয়ানদের। তার ফলে অবশ্য একটা সুবিধে হয়েছিল, আমি খুব চটপট ভালো ইংরিজি শিখে ফেললাম। তবে অন্যান্য অঞ্চলের বার্লিনবাসীদের মতোই কষ্টটা সমানই পেতে হয়েছিল। আমার খিদে পেত। খিদেটাই ছিল আমার সর্বক্ষণের চিন্তা। 1945/46-এর শীতকালে আমি সবসময়ে খিদে আর ঠাণ্ডার জন্যে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়তাম। আমার হাতগুলো ছিল ক্ষতবিক্ষত, কোনো ওষুধ না থাকার কারণে আমি

তাদের চিকিৎসা করতাম হিসি দিয়ে। ছোট ভাইবোনগুলোর ঘ্যানঘ্যানানির অসহ্য আওয়াজ শোনা যেত। ওরা খেতে চাইত। মা নিজের খাবারটুকু ভাগ করে ওদের দিয়ে দিতেন। এর ফলে মা নিজে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। আমি তখনই ঠিক করে ফেলি যে আমি কখনো নিজের পরিবার গড়বো না, তাহলে আর আমায় তার দেখভালও করতে হবে না। একটাই জামা ছিল আমার। সেটা না শুকোলে আমি স্কুলে যেতে পারতাম না। পরের বছরগুলোতেও খিদের সমস্যাটা সমানে চলেছিল। খাবারদাবার কড়া নিয়মে গ্রামের হিসেবে মেপে দেওয়া হতো বটে, কিন্তু আমার সতেরো বছর বয়স অবধি তার পরিমাণটা কখনই পেট ভরার মতো যথেষ্ট হতো না।

রোঃ উরসুলা, অনুমতি দাও, বাচ্চা ছেলে হিসেবে আমি আরেকবার গল্পে ঢুকে পড়ি, বরাতজোরে আমাদের পরিবারটাও যুদ্ধের শেষে আস্ত ছিল, যদিও সে যুদ্ধ পোল্যান্ডের প্রতি ছ'জন নাগরিকের একজনকে গ্রাস করে নিয়েছিল। আমার পরিবার 1946-এ ওয়ারসতে ফিরে এসে থাকতে শুরু করল ভেঙে পড়া একটা বাড়ির বেসমেন্টে কারণ অন্য আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। বেশ ক'বছর আমরা ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই বেঁচে ছিলাম, খিদে পেত আর ঠাণ্ডায় জমে যেতাম। আঠারো বছর বয়স হতে আমি আমার প্রথম নিজস্ব পোশাক কিনেছিলাম। তোমরা খুশি হয়েছিলে কারণ এই যুদ্ধ পরাজয় তোমাদেরই নিজস্ব অমানবিক নাৎসি জমানা থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিল। পোলীয়রাও খুশি হয়েছিল ভেবে যে পরাজয়ের ফলে বিদেশী জার্মান শক্তি পোল্যান্ডকে মানচিত্র থেকে মুছে দেবার এবং এখানকার জনগণকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার মতলবও আর হাসিল করতে পারেনি। কিন্তু অচিরেই বাস্তবিকই আমাদের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরাষ্ট্র[6] হয়ে উঠল। বার্লিনের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ শেষ হল। কিন্তু পোলীয়রা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারল বেশ কয়েকটা বিপ্লবের পর, 'সলিডারিটি'র[7] দশবছর ব্যাপী লড়াইয়ের পর, মাত্র 1989-এর 4 জুনে, বার্লিন-প্রাচীর ভাঙার তিন মাস আগে।

উঃ আমি অবিলম্বে এটাও বুঝলাম যে আমার নিজের এই দুঃখদুর্দশা এতটাই অনিবার্য কারণ নয় যে আমি এই বীভৎস ইতিহাসের বই থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব। এই সদ্য ঘটে যাওয়া ব্যাপক গণহত্যা নিয়ে আরও পড়তে শুরু করলাম। জানতে পারলাম যে 1933-এ স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বিপুল জনসমর্থনে জার্মানিতে নাৎসি সরকার ক্ষমতায় আসে। আমি ভাবলাম, হ্যাঁ, ঠিকই, হিটলার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কিন্তু তার তিনবছর আগে ভোটদাতাদের নিরানব্বই শতাংশই কেন নাৎসি পার্টিকে ভোট দিয়েছিল? কেন হিটলারের বিরুদ্ধে প্রায় কোনো রকম প্রতিরোধই হয় নি?

রোঃ শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও কথাটা সত্যি যে অনেকে, বিপুল সংখ্যক মানুষ ও নিছক অরাজনৈতিক বহু সংগঠন হঠাৎই আত্মপ্রকাশ করেছিল ও প্রকাশ্যে জাতীয় সমাজতন্ত্রে তাদের সমর্থন ও ফ্যুরারের ওপর তাদের আস্থা ঘোষণা করেছিল। এই কথাগুলো এসপেরান্তো হেরাল্ডের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত জার্মান এসপেরান্তোভাষী তেও ইয়ুং-এর।

উঃ যুদ্ধপরবর্তী পরিস্থিতিতে আমার মনে হল যে মানুষ বড্ড তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে চায়। যুদ্ধ না শান্তি—এত বড় দোটানার লোকজন কেমন নির্বিকার ভাবে সেরকমই কাঁধ ঝাঁকায়

যেরকম ঝাঁকাত যখন আমি জ্বলন্ত বাড়ির আগুন নেভাবার জন্যে তাদের ডাকাডাকি করতাম। একটা প্রশ্নই আমার কিশোর মাথায় ঝড় তুলত : এবার আরো কী কী? আমি চাইতাম যে সকল মানুষই যেন ভাই-ভাই হয়ে ওঠে। হঠাৎই আমি একটি ছেলেকে আবিষ্কার করলাম, যে আমার চাওয়াটাকেই নিজের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছিল। এবং শুধু লক্ষ্য স্থিরই করেনি, সেই লক্ষ্যে পৌঁছোবার উপায়ও উদ্ভাবন করেছিল।

রোঃ সেই ছেলেটা হল বিয়ালিস্তোকের ছোট্ট লুদোভিক—আমার অনুমানটা কি ঠিক?

উঃ এক্কেবারে। আমি যে ক্যাথলিক স্কুলটিতে প্রায়ই যেতাম সেখানে আমার বান্ধবী ক্রিস্টা ফেস্ট গল্প করেছিল যে এস্পেরান্তো নামে একটি ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের ভাষা আছে। বুদ্ধির বলিহারি। খাতা-কলমে ভাষা জন্মে গেল, কোনো জাতি ছাড়া, কোনো দেশ ছাড়া? এটা হতেই পারে না, নানান ভাষার সফল শিক্ষার্থী হিসেবে আমি তখন এটাই ভেবেছিলাম। জার্মান ছাড়াও আমি ইংরিজি, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন শিখেছিলাম, খুব চটপট রাশিয়ান শিখে ফেলেছিলাম আর একটু একটু পোল ভাষাও বলতে পারতাম। নেহাৎই কৌতূহলের বশে একদিন আমি আমার সতীর্থদের সঙ্গে আমেরিকান সংস্কৃতিভবনে এস্পেরান্তো শেখানোর শুরুর পাঠ শুনতে গেলাম। শিক্ষক আরম্ভ করলেন এই ভাবে : মি ইরাস আল লা পোরদো কাই মি মালফেরমাস লা পোরদোন (আমি দরজার দিকে যাচ্ছি এবং আমি দরজাটা খুলছি)। কী আশ্চর্য! আমি বাক্যটা বুঝতে পারলাম। একঘন্টার মধ্যে ভাষার মূল চলনটা আমার কাছে এতই প্রাঞ্জল হয়ে গেল যে মনে হল যেন আমি অনেক আগে থেকেই ভাষাটা শিখেছিলাম। তখন থেকেই আমি একজন অত্যুৎসাহী এস্পেরান্তোভাষী হয়ে গেলাম। আমার জীবনে এস্পেরান্তোর আবির্ভাব বিস্ময়কর, ঠিক যেন শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব, সংহতি সম্বন্ধীয় আমার ভাবনা-চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার হাতিয়ারের মতো।

রোঃ এই হাতিয়ারকে কী ভাবে ব্যবহার করলে তুমি?

উঃ 1950-এ, আমার যখন ষোলো বছর, আমি বিভিন্ন দেশের তরুণ-তরুণীদের, শিক্ষক আমাকে যাদের ঠিকানা দিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে পত্রবিনিময় করতে শুরু করি। ওই সব চিঠিপত্র যেন বিশাল পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত জানলার মতো ছিল। অনেক দূরের মানুষজন, যারা আমার অচেনা অগম্য দেশে থাকে, তারাই হয়ে গেল খুব কাছের বন্ধু। আমরা আমাদের আনন্দ সমস্যা সব ভাগ করে নিতাম। তবে আমার সবচেয়ে বেশি চিঠি চালাচালি ছিল ইতালির তোরিনোর সঙ্গে। জুসেপপে চমৎকার এসপেরান্তো লিখতেন। ওঁর চিঠি নানান বিষয়সমৃদ্ধ ও মজাদার হত। যেমন—আমি ফিয়াট-কারখানায় চাকরি করি, যারা পঞ্চাশ হাজার লোককে চাকরি দেয়, কিন্তু সত্যি খাটে মাত্র পাঁচ হাজার লোক। দুর্ভাগ্যবশত আমি ওই পাঁচ হাজারের মধ্যেই পড়ি। ছ'বছর ধরে আমরা পত্র বিনিময় করেছি আর সততই পরস্পরের চিঠির জন্যে অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করেছি। 1956-তে জুসেপপে তরুণদের এস্পেরান্তো ক্যাম্পের আয়োজন করলেন ইতালিতে, গ্রান পারাদিসো পর্বত, চার হাজার মিটার উঁচু যার চূড়া, তার কাছে। তখন আমি গেলাম আর সেই জ্ঞানী ও সুরসিক পত্রলেখকের সঙ্গে আমার দেখা হল। যদিও সেটাই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ তবু আমরা দু'জনেই দু'জনের মধ্যে যেন কতকালের বন্ধুকে খুঁজে পেলাম, একেবারে হরিহর আত্মা। জুসেপপেও আমারই মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কবল থেকে বেঁচে ফেরা মানুষ। যুদ্ধের দিনগুলোতে তাঁরও এমন ঘটেছে যে সকালে যখন ঘুম ভেঙেছে তখন জানা নেই, সন্ধের সময়েও তিনি বেঁচে থাকবেন কিনা।

1957-র 8 মে, বার্লিনের আত্মসমর্পণের ঠিক বারো বছর পর, আমাদের বিয়ে হল। শহর তখনও যুদ্ধের ক্ষতচিহ্নে ভরা, তবু তারই মাঝে নিউকলোন এলাকার ক্যাথলিক প্রার্থনাগৃহে খুশির মেজাজ ছড়িয়ে গেল। যাজক ফের্দিনান্দ এস্পেরান্তোতে প্রশ্ন করা রপ্ত করলেন। এস্পেরান্তোকেই অনুষ্ঠানের ভাষা হিসেবে বাছা হয়েছিল। আইনী বিবাহ চুক্তি সম্পন্ন হল আমাদের এলাকার প্রশাসনভবনে যার বেসমেন্টে আমি যুদ্ধের শেষ লড়াইটা করেছিলাম। বোধহয় ওই জায়গাটাই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, আর আমাকে নতুন পথের দিশাও দিয়েছিল। আমরা সেই মুহূর্তে দেখতে না পেলেও সেই পথই ইতালির গ্রান্দা পারাদিসো থেকে শুরু হয়ে আমাদের দুজনকে ব্রাজিলের আলতা পারাদিসোতে নিয়ে এসেছে।

*রোঃ তোমরা জানতেও না যে সেই 1957-*তেই বোনা এস্পেরোর সূচনা হয়।

টীকাঃ

১. নাৎসি স্যালুট।

২. 9/10-11-1938-এ নাৎসিরা জার্মানি জুড়ে ইহুদিদের সম্পত্তি ধ্বংস করেছিল। তাতে জানলা-দরজা-ঘর-বাড়ি-গির্জা-দোকান-বাজারের এত কাচ ভেঙেছিল যে ওই উন্মত্ত ধ্বংসের দুটো রাতকে ইতিহাসে নাইট অভ ব্রোকেন গ্লাস (জা. ক্রিস্টালনাখট) বলে উল্লেখ করা হয়।

-এ নাৎসিরা জার্মানি জুড়ে ইহুদিদের সম্পত্তি ধ্বংস করেছিল। তাতে জানলা-দরজা-ঘর-বাড়ি-গির্জা-দোকান-বাজারের এত কাচ ভেঙেছিল যে ওই উন্মত্ত ধ্বংসের দুটো রাতকে ইতিহাসে নাইট অভ ব্রোকেন গ্লাস (জা. ক্রিস্টালনাখট) বলে উল্লেখ করা হয়।

৩. তাইগা : উত্তর সাইবেরিয়ার মনুষ্য বিবর্জিত জলাভূমিময় আদিম পাইন জঙ্গল।

৪. মিনারেতো : মস্কোর মসজিদের আজান-বারান্দা।

৫. 1940-এ রাশিয়ায় কাতিন ফরেস্ট ম্যাসাকার।

৬. 1989 অবধি পোল্যান্ডের নাম ছিল পিপলস রিপাবলিক অভ পোল্যান্ড ; দেশের আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ণ হস্তক্ষেপ করত ও পোলীয় বাহিনীতে 80% ই তাদের লোক থাকত এবং দেশে রেড আর্মি মোতায়েন ছিল।

৭. ইংরিজিতে পুরো নাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেল্ফ-গভর্নিং ট্রেড ইউনিয়ন 'সলিডারিটি'। 1980-র 31 আগস্ট ওয়ারসতে প্রতিষ্ঠিত পোল্যান্ডের প্রথম অ-কম্যুনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন। সংগঠনটি বিপুল জনসমর্থনে অসামরিক প্রতিরোধের মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

উৎসগ্রন্থ

Dobrzyn`ski, Roman. 2008. Bona Espero : idealo kaj realo. Stano Marcek : Slovakio.

একটি অনন্য জীবন
এক স্মৃতিভ্রষ্ট ভারতীয়
অভিজিৎ মুখার্জি

ইতিহাস পরিবর্তনশীল তো বটেই! পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর মতো বড় কিছু ঘটার ঠিক অব্যবহিত আগের যে সময়, ইতিহাসে তার যেকোনও বিবরণ একান্তই নীরক্ত হয়ে পড়ে ঐ কথাটা যোগ না করলে : ''কেউ তখন জানে না কী আসলে ঘটতে চলেছে।'' ক্রমেই ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় যে জিনিসটা বেশি করে জায়গা করে নিচ্ছে সেটা এই ইতিহাসের পরিবর্তনশীলতার দিকটা। অন্যান্য বিভিন্ন সময়ের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একটা সময়ের ইতিহাসকে দেখতে গেলে সেই ইতিহাস তাই অপূরণীয় অসম্পূর্ণতায় ভুগবে। এই সত্যটিকে সচেতন, বস্তুনিষ্ঠ ও সৎ মানসিকতায় খেয়াল রেখে চললে ইতিহাসবীক্ষা নেহাতই ঘটনার পারস্পরিক খতিয়ান হওয়া অতিক্রম করে হয়ে উঠতে পারে মানুষের একটা সার্বিক মূল্যায়ণ ও জীবনের কিছু অমূল্য সত্যের হদিস। মানুষের আত্মিক শক্তি যে তাকে কোন উচ্চতায় উন্নীত করে শাশ্বত মানুষকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারে, স্থান-কাল নির্বিশেষে বারে বারেই তার নিদর্শন পাওয়া গেছে এবং ইতিহাসে এরকম কিছু কিছু উপাদান থেকেই যায় যা সেই সত্যের ওপরে আলো ফেলে আমাদের গোচরে নিয়ে আসে।

তাকেশি নাকাজিমা তাঁর পি.এইচ.ডি. থীসিসের জন্য প্রথমে পান এশিয়া প্যাসিফিক রিসার্চ আওয়ার্ড, আর তারপর যখন সেটি 2005 সালে বই হয়ে বেরুলো তখন পেলেন আসাহি শিমবুন প্রদত্ত 'ওসারাগি জিরো রোনদান' পুরস্কার, যার কদর খুবই বেশি। মূল জাপানিতে বইটার নাম 'নাকামুরাইয়া নো বোস', বাংলায় যার অর্থ নাকামুরার দোকানের (রেস্তোরাঁ'র) বোস। বইটা ইংরিজিতে অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক প্রেম মোতোয়ানি, জাপানি থেকে ইংরিজিতে অনুবাদের জগতে যাঁর পরিচয় সর্বজনবিদিত। তাকেশি নাকাজিমা জানাচ্ছেন যে তাঁর জীবনের কুড়ি থেকে তিরিশ এই বয়েসটা কেটে গেছে বোস সম্পর্কিত যাবতীয় নথির পেছনে ছুটে আর ধীরে ধীরে তার এই গবেষণাগ্রন্থটিকে ধারণায় মূর্ত করে তুলতে।

এই বইয়ে যা আছে তার ভিত্তিতে যদি বইটা নিয়ে আলোচনা করতে হয় এবং সেই সূত্রে লিখতে হয় রাসবিহারি বসু সম্বন্ধে তবে আমি শুরু করবো একটা তালিকা দিয়ে, কয়েকজন লোকের নামের তালিকা : রিয়োহেই উচিদা, সাকুজিরো মিওয়া, নাগাতোমো কায়া, শু হিরায়ামা, ইয়াসুতারো হোনজো, হানসুকে মাতোনো,

য়োশিনোরি ওহারা, শোকিচি ওজাকি, বাইগিয়ো মিজুনো, ইক্কান মিয়াগাওয়া, য়োশিও শিরোইশি, কারণ হয়তো এই বইয়ের বাইরে আর কখনো কোথাও এঁদের কথা উল্লেখ করা হবে না, অথচ আমাদের এঁদের স্মরণে রাখতেই হবে। কেননা আমাদের দায় মনুষ্যত্বের সার্বিক ধারণাটির কাছে। হ্যাঁ, এঁরা ছিলেন নেহাতই সাধারণ মানুষ, আর সচরাচর জাপানিরা যেমনটা হয়, ছিলেন দেশপ্রেমিক। ব্রিটিশ রাজশক্তির হাত থেকে, আর তখনকার জাপানি শাসকদের নজর থেকে রাসবিহারি বসুকে রক্ষা করতে এঁরা মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ উঠলে কপালে যতখানিদ ুর্গতি েলখাথ াকতে পােরত ার পুরোটাইে খয়ালে রখেএ ঁদেরে সইঝ ুঁকি নিতে হয়েছিল। এবার কল্পনা করার চেষ্টা করুন তো অতখানি বেপরোয়া ওঁরা কেন হয়েছিলেন! সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তির অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর যে লড়াই, সেই লড়াইয়ে সমস্ত ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যক্তিটিকে যদি সেদিন তাঁরা সাহায্য না করেন তাহলে জাপান সম্বন্ধে ভারতবাসীর ধারণাটা কী হবে সেটাই ছিল সেদিন তাঁদের মাথাব্যথা! বাকিটুকু সহজে, নিজের দেশের ভাবমূর্তিটিকে বিশ্বের সামনে উজ্জ্বল রাখতে যা যা করা দরকার দেশপ্রেমিকদের তো তা করতেই হবে। এটা কোনও প্রাচীন লোকগাথা কিংবা মহাকাব্যের কাহিনী নয়, এই সেদিনকার, 1915 সালের কথা! যাঁরা সেই সময়ে জাপানের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত নন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানানো যেতে পারে যে সেই সময় জারি ছিল ইঙ্গ-জাপানি সহযোগিতা চুক্তি এবং কিঞ্চিত প্রাথমিক ইতস্ততার পর ব্রিটিশদের উপর্যুপরি পীড়াপীড়ির মুখে 1915 সালের 28 নভেম্বর জাপান সরকার সিদ্ধান্ত নেয় রাসবিহারি বসু ও অন্য আরেকজন পলাতক বিপ্লবী শ্রী হেরম্বলাল গুপ্তকে ব্রিটিশের হাতে তুলে দেওয়ার। তাইশো যুগের শুরুতে নতুন সম্রাটের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে খোদ লালা লাজপত রাই তখন জাপানে!

প্রথমে ভাইসরয় হার্ডিঞ্জের প্রাণনাশের চেষ্টা আর তার পরে পরেই লাহোরে সেনাবিদ্রোহ, এই দুই ক্ষেত্রেই রাসবিহারি বসুই ছিলেন মূল হোতা, আর ব্রিটিশও তাই শিকারিকু কুরেরম তোে পছুনি য়েছিলত ঁার াডৈ নিছি লেনম ূলতফ রাসীডৈ পনিবেশ চন্দননগরের বাসিন্দা, আর সেই কারণে কয়েকবার রক্ষাও পেয়ে গেছিলেন, কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে বসু ভারত ত্যাগ করে জাপানে যাবেন এবং সেখান থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য রসদ সংগ্রহের কাজটি চালিয়ে যাবেন। সেই যাত্রায় :

সমুদ্রের বুকে বহুদূরে একটা ক্ষীণ আলো দেখা গেল। ক্যাপ্টেন বলল, "ওখানে আন্দামান!" শুনেই আতঙ্কের হিম হয়ে যাওয়ার একটা অনুভূতি হল। এই ব্রতে আমার বহু ভ্রাতৃপ্রতিম সাথি ওখানে বন্দী হয়ে আছে, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন কেটে যাচ্ছে নিরর্থক। গ্যারিবলডি কিম্বা ওয়াশিংটন নিজের নিজের দেশের জন্য যা করেছিলেন এই সাহসি যুবারাও সেই একই কাজে নেমেছিলেন। কিন্তু ব্যর্থতা আজ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষাকেই তাদের নিয়তি করে তুলেছে। একথা ভেবে অপমানে আর দুঃখে আমার চোখ থেকে জল ঝরতে লাগলো।

1915 সালের 22 মে, যে জাহাজে পাড়ি দিয়েছিলেন জাপানের উদ্দেশ্যে তা এসে ভিড়লো সিঙ্গাপুরের উপকূলে—এ সেই সিঙ্গাপুর যেখানে মাত্র ক'মাস আগেই

ব্রিটিশের আবেদনে জাপানি সৈন্যরা বিদ্রোহী ভারতীয় সৈন্যদের দমন করে তুলে দিয়েছিল ব্রিটিশের হাতে। ভারতীয় সৈন্যদের সেই বিদ্রোহের ডাক এসেছিল গদর পার্টির থেকে। নিয়তি তখন অলক্ষ্যে মৃদু হেসেছিল হয়তো বা—পরেরবার যখন প্রায় কাছাকাছিই একটা পরিস্থিতি তৈরি হবে এই সিঙ্গাপুরেই, রাসবিহারি বসুর যে তখন একটা বিশেষ স্বতন্ত্র ভূমিকা থাকবে, ইতিহাসে যার তুলনা মেলা ভার, সেই 1915-তে কেই বা তখন জানতো! ভারতে থাকতে ব্রিটিশকে বারবারই ফাঁকি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার গল্পগুলো নেহাতই রোমহর্ষক, তবে ভারত ছেড়ে যাওয়ার পথে এই সমুদ্রযাত্রায় ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষর চোখে ধুলো দেওয়ার একের পর এক বিবরণেও সেই রোমহর্ষকতা সমান ভাবেই বজায় থাকে! সেইসব ঘটনাকে একমাত্র ভোজবাজি ছাড়া বোধহয় আর কোনও আখ্যা দেওয়া যায় না, এইসব ঘটনার সাক্ষী থাকলে, শতবার সেই বহুশ্রুত সাবধানবাণী খেয়াল করিয়ে দিলেও হোরেশিও নিজের অবিশ্বাস ঘোচাতে পারতো কিনা সন্দেহ!

সাংবাদিকদের একটা বড় অংশের থেকে বিস্ময়কর রকম সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন বসু। জাপানি ভাষা জানা না থাকায় জাপানবাসীর সঙ্গে ভাষার আদানপ্রদান করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। এক সহায়সম্বলহীন, পরিচয়হীন ভারতীয়, তার উপরে আত্মগোপনকারি এবং স্থানীয় ভাষা একেবারেই জানা নেই, এহেন অসম্ভব পরিস্থিতিতে কী করে ওঠা সম্ভব? উনি দ্বারস্থ হয়েছিলেন কয়েকজন সাংবাদিকের আর পেয়েছিলেন নিঃসংকোচ, নির্ভীক সাড়া। পরে তাঁদেরই মাধ্যমে সহায়তা পেলেন বেশ ক'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বেরও। একসময় যখন গ্রেফতার হওয়া হয়ে উঠলো অনিবার্য, তখন একদিন সন্ধ্যায় ঐ যেসব দেশপ্রেমিকের নাম করেছি গোড়াতেই, সেই সুহৃদরা জড়ো হলেন রাজনৈতিক তোয়ামা'র বাড়িতে এক উল্লাসমুখর পার্টিতে, আর সেখান থেকেই সন্তর্পণে বসুকে সরিয়ে দেওয়া হল নাকামুরার রেস্তোরাঁতে রাঁধুনির ভূমিকায়। শুরু হল অন্তরীণ জীবনের এক অসহ্য পর্যায় আর সেই পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে হাতের কাছে কিছুক্ষণের জন্য হলেও অন্যান্য কর্মচারিদের মধ্যে যখন যাকে পাচ্ছেন তার কাছ থেকে ভাষা শিখে নিতে থাকলেন রাসবিহারি বসু।

তারপর একসময় বসু ঐ রেস্তোরাঁ-র মালিক দম্পতির মেয়ে তোশিকোকে বিয়ে করলেন। বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল খোদ তোয়ামার কাছ থেকে, তিনি সেই সময়ের একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ রাজনীতিবিদ। ব্যাপারটা কিন্তু খুব সহজ ছিল না :

কোক্কো, মেয়ের মা, এতে খুবই ভেঙে পড়লেন, সাধারণভাবে একজন মা হিসেবে এবং একজন সাধারণ মানুষ যা করে, উনিও তার মেয়ের সুখী জীবন প্রার্থনা করেছিলেন। গোয়েন্দারা সহজে বসুর পেছন ছাড়বে না, তাই তাঁর সঙ্গে তোশিকোর বিয়ে হলে তোশিকোর ওপরেও চাপ থাকবে খুব। নেহাতই একজন বিদেশির স্ত্রী হওয়ার সাধারণ সমস্যা এটা নয়। যদিও বোঝাই যাচ্ছিল যে বসুকে বিয়ে করা আর মৃত্যুকে আহ্বান করে আনা প্রায় কাছাকাছিই, তবুও প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দেওয়া অত সহজ ছিল না, কারণ সেটি এসেছিল খোদ তোয়ামা'র মতো একজনের কাছ থেকে।

ভাল করে ভাবো এটা নিয়ে। যদিও সবাই খুব মানসিক চাপের মধ্যে আছে, তুমি তবু তাড়াহুড়ো কোরো না, কারণ একটা সাধারণ বিয়ের সঙ্গে এ বিয়ের অনেক ফারাক।

একথা শুনেও তোশিকো তার শান্ত, অচঞ্চল ভাব বজায় রাখে এবং মাথা ঝুঁকিয়ে সাড়া দেয়। দেখতে দেখতে দুই সপ্তাহ কেটে গেলে তোয়ামা আবার তাঁর প্রস্তাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কোক্কো তখন মেয়ের কাছে তার মনের কথা জানতে চান, তোশিকো উত্তর দেয়, ''মা আমাকে যেতে আজ্ঞা কর, আমি মনস্থির করে ফেলেছি।''

সময়ের সাথে পরিচিতির বৃত্ত যতই বিস্তৃত হতে থাকল, কোনও সচেতন প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও ওঁর এমন একটা ভূমিকা তৈরি হল যা এই বইয়ের লেখকের মতে অত্যন্ত তাৎপর্যময়। জাপানের রাজনৈতিক আদর্শের ধারাগুলো তখন বইছিল মূলত তিনটি খাতে : গেন্‌য়োশা কর্মসূচির মূল কথাটি ছিল, 'যে নাগরিকেরা সম্রাটকে ভক্তি করে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ তাদের অধিকার রক্ষা করে চলা।' ক্রমে এদের দৃষ্টি বিস্তার পেয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা এশিয়ার ওপর এবং পশ্চিমি শক্তিগুলোর হাতে নির্যাতিত যাবতীয় এশিয়াবাসীর প্রতিই এরা সহানুভূতিশীল মনোভাব অবলম্বন করতে থাকল। আরেকটি ধারা আবার 'আদর্শ' জিনিসটাকেই গৌণ বিবেচনা করতো। এরা গুরুত্ব দিত কুশলতা, আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও কর্মক্ষমতার ওপর। এছাড়াও তৃতীয় একটি আদর্শ তখন সবে উন্মেষ লাভ করছে যার প্রবক্তারা মনে করছিল এশিয়ার সমস্ত দেশের সমান অধিকার আছে জাতিগত স্বায়ত্তশাসনে এবং সার্বভৌমত্বে, এবং সেটা কোনও ভাবেই জাপানের স্বার্থসাপেক্ষে নয়। রাসবিহারি বসু হয়ে উঠেছিলেন এই দলগুলোর মধ্যে একটা জোরালো সংযোগসূত্র এবং ওঁকে কেন্দ্র করেই এই দলগুলো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করতো। লেখক জানাচ্ছেন : সেই সময়ে বসুর এই গোপন কার্যকলাপের মাধ্যমে শুধু যে বহু জাপানবাসী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিষয়ে অবহিত হলেন তা-ই নয়, জাপানের পুনর্গঠন আন্দোলনের জনসংযোগের দিকটিও এর ফলে এবং এর পাশাপাশি প্রভূত পুষ্টি লাভ করল।

বহিরাগত কোনও কিছুর প্রতি আজকের জাপান তুলনায় যতোটা মনোযোগী, কোনও প্রভাবে সাড়া দিতে যতোটা প্রস্তুত, সেই সময়ের চিত্রটা সেরকম ছিল না। কিন্তু তবু, যাঁদের এমনকি আজকের জাপানি সমাজে বসবাসের সরাসরি অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন, এমনকি নগরাঞ্চলেও এহেন স্বীকৃতি, যা বসু পেয়েছিলেন, আজও নেহাতই অচিন্ত্যনীয়! ভাবাই যায় না যে এক পরাধীন দেশের এক নাম-গোত্রহীন অসহায় আশ্রয়প্রার্থী এসে একদিন এতটা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করলেন, বিদেশে এতোটা শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারলেন, তাও আবার জাপানে। তুলনীয় অন্য কোনও উদাহরণ আছে? নেই।

কয়েক দশক আগেও এই মহাদেশে জাপানের মতো এগিয়ে যাওয়া, এতোটা শক্তিধর দেশ আর একটিও ছিল না, অথচ সেখানকার এশিয়াকেন্দ্রিক চিন্তাধারার বা এশিয়ান-ইজমের মূলে বসুর অবদান ছিল অপরিসীম। কল্পনা করুন তো একটা পরিস্থিতি, 1926 সালে ওসাকাতে প্যান-এশিয়াটিক কংগ্রেস হচ্ছে, তাতে যোগ দিচ্ছেন জাপান, চিন, কোরিয়া, ভিয়েতনাম থেকে আসা বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা, সাংসদরা, আর তার অধিবেশন পরিচালনার ভার কার ওপর, না একজন নির্বাচিত ভারতীয়ের ওপর যার কোনও বৈধ নাগরিক পরিচয়ই নেই। না, আমার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়।

নানা কারণে সেই কংগ্রেস উত্তাল হয়ে উঠেছিল নানাদেশের মধ্যে তীব্র পারস্পরিক বিরোধিতায়, কিন্তু 'ওসাকা মাইনিচি' নামের খবরের কাগজে এই প্রসঙ্গে ছাপা হয়েছিল নিচের মন্তব্যটি :

দুদিন ব্যাপী এই সম্মেলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, ভারতের প্রতিনিধি মিঃ বোস যেভাবে এর পরিচালনা করলেন। অত্যন্ত সাবলীলভাবে জাপানি বলছিলেন এবং কোনওরকম মতদ্বৈত বা মতানৈক্য হলেই সুকৌশলে এমনভাবে হস্তক্ষেপ করছিলেন যাতে কোনও পক্ষেরই আত্মাভিমানে আঘাত না লাগে, এবং এইভাবে পুরো সম্মেলনটা সামলেও নিলেন চমৎকার।

লেখকও আমাদের জানাচ্ছেন : *নানা বিতর্কিত বিষয় থাকা সত্ত্বেও রাসবিহারি বসুর সতর্ক ও তৎপর তত্ত্বাবধানে সেই দুইদিন ব্যাপী আলোচনা তেমন কোন ঝঞ্ঝাট বা বিরোধিতা ছাড়াই সম্পন্ন হয়।*

বসুর রাজনৈতিক ব্রতে এশিয়ামুখীনতারও স্থান ছিল, আর সেই ব্রতের ভিত্তি ছিল তার ধর্ম সম্পর্কিত দর্শন ও প্রাচ্যের ইতিহাস। শ্রী অরবিন্দের ধর্মীয় দর্শন দ্বারা তিনি গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। হিন্দুধর্মে আত্ম-বলিদানের যে মহিমা, সেটাই ফুটে উঠেছিল ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর সার্বিক আত্ম-নিয়োগের মধ্যে দিয়ে। তিনি লিখেছিলেন :

পৃথিবী থেকে যদি যুদ্ধের ভয়াবহতা দূর করতে হয়, তাহলে নানা জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে অবিশ্বাস ও শত্রুতাবোধ ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায় তা ত্যাগ করতে হবে। তার পরিবর্তে গড়ে তুলতে হবে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব। কীভাবে করা যায়? ধর্মের আশ্রয় না নিয়ে তা করা সম্ভব নয়।

এছাড়াও,

অতীতে বিশ্বের ইতিহাসে এশিয়া এক অতি গৌরবজনক স্থান অধিকার করেছিল। এর কারণ, এশিয়া ছিল সারা বিশ্বে সঞ্চারিত হওয়া সংস্কৃতি ও সভ্যতার পীঠস্থান, তখন জনজীবনে শান্তি ছিল, আনন্দ ছিল। পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে যে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের উদ্ভাবন করতে হবে এক নতুন সংস্কৃতি যাতে বর্তমানের এই নানা বিঘ্ন, ভাগ্যবিপর্যয়, দুরবস্থা ও কষ্টের থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করা যায়। তার জন্য আগে দরকার এশিয়ার সার্বিক স্বাধীনতা ও মুক্তি।

বিংশ শতকের বিশ-এর দশকের শেষ দিকটায় রাসবিহারি বসুর কর্মতৎপরতা একেবারে তুঙ্গে উঠলো। যেসব সাময়িকপত্রের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের সরাসরি যোগ ছিল, একদিকে যেমন সেগুলোতে মহাউৎসাহে লেখালেখি শুরু করলেন, অন্যদিকে নিজেকে নিয়োজিত করলেন জাপানে বসেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরো জোরালো করে তুলতে। সেই সময়ের ভারতের প্রতি জাপানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ও জাপানকে ওয়াকিবহাল রাখতে 1930 থেকে তিনি 'গেক্কান নিপ্পোন'-এ সাংবাদিক শুমেই ওকাওয়া'র সঙ্গে যৌথভাবে Pan Asia Communication নামে এক কলাম-এ প্রতিবেদন লিখতে শুরু করেন। তাকেয়ো নাকাতানির সঙ্গে যৌথভাবে লিখলেন নিজের প্রথম বই, *Prospects of Revolution in Asia*। ক্রমে প্রায় কুড়িটির মতো বই

হয় এককভাবে, নতুবা কারও সঙ্গে যৌথভাবে লিখেছিলেন অথবা অনুবাদ করেছিলেন। এর পাশাপাশি বহু সাময়িকপত্রে নিবন্ধ লিখছিলেন ভারতে ব্রিটিশের স্বৈর-শাসন ও ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ নিয়ে। প্রায় প্রত্যেক বছরেই ওঁর একটা করে বই বেরুচ্ছিল, আর সাময়িকপত্রে লিখছিলেন একেক সময় মাসে পাঁচটিরও বেশি হারে। কিন্তু এই লেখাগুলোর অধিকাংশই যেহেতু ছিল জাপানি ভাষায় তাই নিজের জন্মভূমিতে এর তেমন কার্যকারিতা ছিল না বলে অবশেষে একসময় উনি শুরু করলেন ওঁর নিজের সাময়িক পত্র ‘শিন আজিয়া’ বা New Asia। সেটা 1933 সাল। ম্যাগাজিনটা বেরুত জাপানি ও ইংরিজি উভয় ভাষাতেই এবং ভারতে ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের যেসব নেতারা ছিলেন বেশ তৎপর, গোপনে পাঠিয়ে দেওয়া হত তাঁদের কাছে। একটি আত্মজীবনীও শেষ অবধি লিখে রেখে গেছেন, সেটা অবশ্য জাপানিতে লেখা।

বেশ অল্প বয়েসেই স্ত্রী মারা গেলেন, দূরদেশে স্বজনহারা বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিলেন, স্বদেশের শৃঙ্খলমোচন এই জীবনে দেখে যেতে পারবেন কি না তারও কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু জীবনের একমাত্র অর্থ তো ছিল আরব্ধ ব্রতটি সম্পন্ন করে যাওয়া, আর কিছু তো নয়! শুধুমাত্র একবার যেন, এক কোরীয় দেশসেবকের সাহচর্যে, প্রকাশ হয়ে পড়েছিল দীর্ঘদিন সম্বরণ করে রাখা অবদমিত আবেগ! কোরীয় বলেই স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে নিজের দোসর বিবেচনা করেছিলেন তাঁকে।

জাপান জুড়ে নানা স্থানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে যত জায়গা দেখেছিলেন তার মধ্যে সাকাদা'র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ওঁকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল ... চমৎকার দৃশ্যাবলী চোখে পড়ে হয়তো ওঁর স্বদেশের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আর উথলে উঠেছিল বাঁধনছেঁড়া আবেগ। অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন ‘একা’, নৌকোর পাটাতনে বসে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন ... ভারতের স্বাধীনতার লড়াইতে সমস্ত ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে তুচ্ছজ্ঞানক রে চষ্টাচ ালিয়েয াওয়াব সুরজ ীবনেস াকাদা'রএ ইঘ টনাইস স্তবতব ্যক্তিগত আবেগ প্রকাশ হয়ে পড়ার একমাত্র নজির।

1945-এ নববর্ষের দিন ছেলে মাসাহিরো ইয়াসুওকা এসেছিলেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে। পুত্রের মুখে স্থির দৃষ্টি ফেলে বাবা বললেন,

"জাপান হারছে। আর বোধহয় কিছু করা যাবে না। কিন্তু তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে আত্মদীপ হয়ে, জাপানের লোকেদের জন্য, সমগ্র এশিয়াবাসীর জন্য। এটুকুই আমার তোমার কাছে প্রার্থনা।"

একুশে জানুয়ারি বসুর মৃত্যুর পরেই ছেলে আবার ফ্রন্টে ফিরে যান, 16 জুন ওকিনাওয়াতে যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রায় রূপকথার মতো, লোকগাথার মতো রাসবিহারি বসুর বর্ণময় জীবন ছাড়াও এ বইতে আরও এমন বহু অজানা, অল্প শোনা নামের মানুষের কথা আছে যাঁরা স্বাধীনতার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পৃথিবীর নানা কোণে গিয়ে কাজ করেছেন এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই মুক্তির সংগ্রামের বেদীতে আত্মবলিদান করেছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধির নেতৃত্বের ধরণ রাসবিহারি বসুকে হতাশ করেছিল, 1938-এ চিন-জাপান যুদ্ধের সময় মধ্যস্থতার উদ্যোগ নিয়ে বসু যখন রবীন্দ্রনাথের একটা ভূমিকা প্রার্থনা করে জাপানে আসার আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন কবি কিন্তু তা পত্রপাঠ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন এই সংকট প্রসঙ্গে ইয়োরোপিয় দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। রাসবিহারি বসুর প্রধান ভরসার পাত্র ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। রাসবিহারি বসুর যাবতীয় কৃতিত্বের মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ যে অধ্যায়, কীভাবে সেই আই.এন.এ. গঠন হল সেই গল্প আমি আর এখানে লিখছি না, পাঠক বইটি এক কপি সংগ্রহ করে পড়বেন, নিজেকে গর্বে, স্বপ্নে ভরিয়ে তুলবেন, এই প্রত্যাশায়। জাপানের বিদেশনীতি নির্ধারণে ততদিনে রাসবিহারি বসু হয়ে উঠেছেন রীতিমত একটি গ্রাহ্য করার মত নাম।

সেই কালে আধুনিকতার ইয়োরোপীয় ধারণার যে প্রতাপ, বসু সেটাকে তেমন আমল না দেওয়ায় ইতিহাসের ভাষ্যকারদের তেমন আনুকূল্য ওঁর ভাগ্যে স্বাভাবিকভাবেই জোটেনি। যুগে যুগে ক্ষমতাই ইতিহাস চর্চার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রক, তাদেরই দাক্ষিণ্যে ইতিহাস চর্চায় বাহবা আর রসদের যোগান। ক্ষমতার নির্দেশ অমান্য করা ঐতিহাসিকের পক্ষে সহজ কাজ নয়। সেই রীতি অব্যাহতই আছে, এই বইতেও কয়েকটি অনুচ্ছেদ যেন সেই বাধ্যবাধকতার থেকেই জন্ম নিয়েছে, বিভিন্ন সময়ে রাসবিহারি বসুর কিছু পদক্ষেপ ও অবস্থান বেশ অনুমানযোগ্য কারণেই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে এখানেও। তবে কিনা, সেই সব অংশের গদ্য ও উপস্থাপনা এতটাই ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন আনে এবং ছাড়াছাড়া যে এসবের উপস্থিতির প্রকৃত কারণ অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না। আজকের পরিস্থিতিতে সেই বেদনার, সেই বিপর্যয়ের, সেই হতাশাব্যঞ্জক ঘটনাবলীর, সাফল্যের, ব্যর্থতার খতিয়ানগুলো অভিঘাতের নিরিখে হয়তো গৌণ হয়ে এসেছে, কিন্তু যা উজ্জ্বল, অমলিনভাবে পূর্ণ মহিমায় রয়ে গেছে তা হল একটি আশ্বাস : একটা জীবন হয়ে উঠতে পারে আত্মস্বার্থহীন ব্রতের একটা অগ্নিশিখার মতো, রাসবিহারি বসু তাঁর নিজের জীবনের মাধ্যমে তার নজির রেখে গেছেন। 1944 সালে উনি মারা যান, জাপানে ওঁর স্মৃতি আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসছে। শুধু নাকামুরার দোকানে রাঁধুনীর কাজ করতে করতে যে 'কারি' একটি পদ হিসেবে প্রবর্তন করেছিলেন, ইয়োকোহামার বিখ্যাত নাকামুরা'র দোকানে সেই পদটির জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে যে অসম্পূর্ণই তিহাসঅ ারোপের চষ্টাফ লবতীহ য়েছে,ত ারইস্বার্থেব. াসবিহারিব সুর স্মৃতিকে অটুট রাখার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ইতিহাসের এই উপেক্ষিত নায়কের অবিশ্বাস্য কীর্তিগুলোর কথা বাংলার যুবসমাজ কখনও জানতে পারিবে কিনা সে এক সুকুমার রায়ের 'আশ্চর্য কবিতা' গল্পের শ্যামলালই জানে হয়তো।

Bose of Nakamuraya by Takeshi Nakajima (trans. Prem Motwani), Promilla & Co., Publishers in associa on with Bibliophile South Asia, New Delhi, 2009, p-323, Rs. 700/-.

কবিতা

পরিধির মধ্যে এসো
মধুমিতা রুদ্র

সমস্ত শব্দ বাঙ্ময়তা ভুলে নিস্তব্ধতার দিকে
চলে যায় যদি।
সমগ্র সময় এই অসময়ে হঠাৎই শেষ
হয়ে যায় যদি।
কি করে দূর হবে তোমার আমার মাঝে
এই অপার ব্যবধি?
থেকে থেকে কিছু শব্দ উচ্ছলতা পায়
মনে মনে,
তারপর হারিয়ে যায়, ছিন্নভিন্ন হয়
ময়না তদন্তে।
তুমি কি করে জানবে এই সমস্ত কথা
আড়াল থেকে?
পরিধির মধ্যে এসো, বিক্ষিপ্ত সব শব্দকে
সাজাও অনুরাগে,
মিত্র অমিত্রের ভেদভুলে তোমার দৃষ্টি জেগে উঠুক
কবিতার আঁতুড় ঘরে।
প্রথম পংক্তিতে নয় তুমি নেমে এসো আমার কবিতার
শেষ দুটি পংক্তির নীড়ে।

কারণ আমি থামতে পারিনি মৃত্যুর জন্য

"Because I could not stop for death" - by *Emily Dickinson*

কারণ আমি থামতে পারি নি মৃত্যুর জন্য
সে কিন্তু থেমেছিল আমার জন্য, তাঁর
চলমান রথে ছিলাম আমরা - মৃত্যু।
আমি এবং অমরত্ব।

ধীরগতি সেই রথ, তার কোনও তাড়া
ছিল না। আমি সেই বিনম্র মৃত্যুকে সমর্পণ
করেছিলাম আমার কর্ম এবং অবসর।

ক্রীড়ামোদী ছোটছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়কে
পিছে ফেলে, পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্রের পাশ
দিয়ে আমরা চলেছিলাম, আমরা
চলেছিলাম অস্তমান সূর্যকে পাশে রেখে -

অথবা সেই সূর্যই আমাদের পিছনে রেখে
চলে গিয়েছিল। তাই শিশিরের ছোঁওয়ায় শুভ্রবস্ত্রে
আমি ছিলাম শীতলতায় লীন।

সেই চলমান যান এসে থেমেছিল বিচ্ছিন্ন
বিচ্ছিন্ন স্তূপাকৃতি মাটির কাছে। মাথার ওপর
ছিল রাতের তারা ভরা আকাশ,
ছিল না আর কোনও আড়াল।

সেই ক্ষণে আমার মনে পড়ে গেল
কোন্ এক স্মরণাতীত কালে সে যেন ডেকেছিল
আমায় - সে কি মহাকাল! সঙ্গে সঙ্গে
শতবর্ষের ব্যবধান ঘুচে গেল, মনে হল এই তো
সেদিন সে ডেকেছিল আমায়!

আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করলাম
আমাদের সেই ধাবমান মৃত্যুরথের অশ্বেরা
চলেছে চিরন্তন সত্যের দিকে - অমরত্বের
দিকেই তাদের মুখ, অনন্ত তাদের যাত্রা!

অনুবাদক : মধুমিতা রুদ্র

প্রার্থনা

শশাঙ্কশেখর পাল

পায়ে পায়ে এসেছি খেয়াঘাটে
ঢেউ ভেঙে ভেঙে এপার ওপার

জলের গভীরে যে পাথর আলো দেয়
তার মায়ানুর

ছুঁয়েছে সৌর চেতনা
মনন থেকে ঝরে পড়ে
নৈবেদ্য

হে পৃথিবী ভালো থেকো।

মানসলোকের

কৌশিক দাশগুপ্ত

তুমি তো আঁকলে তুলির আঁচড়ে
মনের রঙে এক পারিজাত
কি করে বেরোলো
ক্যানভাস থেকে ঘ্রাণ?
এ যেন ঠিক মানসলোকের
মানসসরোবরের মধ্যে
ডুব দিয়ে এক পুণ্য বারি স্নান!!

সমীকরণ
বিবেক কবিরাজ

বুক-ভাসানো জলোচ্ছ্বাস নিয়ে
এগিয়ে যাই মহানন্দা তিস্তার সাথে
দূরে ডাকে সমতল।
সবুজ বনের জঠর এইমাত্র জন্ম দিল
আরো এক পাগলাঝোরার
ঋতুচক্র ধর্ম মন্ত্রে ঘোরে
গোম্ফায় ঘণ্টা বাজে
নেমে আসে শব্দের ঢল।
পুজো শেষ। বিসর্জিত
প্রতিমার হাড় নদীতীরে
সমীকরণ ভিন্ন ভিন্ন তল।

প্রত্নশিলা
পায়েলী ধর

তোমায় আমায় শিলা করে ফেলি
তুলে রাখি শিলার ভিড়ের গাদায়
শিলা ঘুমাক মাটির বুকের নিচে
শিলা ঘুমাক প্রেমের গোলোক ধাঁধায়।

শিলা লুকোক গহীন গর্তে একা
শিলা থাকুক তফাৎ দূরের সাথে
শিলার দেহে উঠবো আমরা জেগে
প্রত্নতত্ত্বে অতীত স্মৃতির সাথে।

চিঠি

কয়েকদিন আগে সমতটের দুটি সংখ্যা আমার হাতে আসে যেখানে লেখিকা শ্রীমতী মীনা দাঁ একটি বিতর্কিত বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করেন। বিষয়টি যেহেতু বিতর্কিত এবং এখনও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি, তাই দু-চারটি কথা।

বাংলা সাহিত্য এখন কোণঠাসা হতে হতে এক বদ্ধ জলাশয়ের অবস্থা নিয়েছে। ক্লাসিক সাহিত্য বলতে এখনও আমরা সেই পুরোনো সাহিত্যকীর্তিরই উল্লেখ করি। পাঠক সংখ্যার অপ্রতুলতা দূর করতে, নূতন নূতন পাঠকসমাজ তৈরি করাই বর্তমান চিন্তাবিদদের লক্ষ্য। তাঁরা সেই ক্ষেত্রে তিনটি গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করেছেন। প্রথম গোষ্ঠীপ্রবাসেব সবাসকারী,ব াংলাব লতেও শু নেব ুঝতে পারেনও স বারও পরে সাহিত্যপিপাসু। দ্বিতীয় দলে এ রাজ্যেই বহুদিন বসবাসকারী অবাঙালী সম্প্রদায়। যাঁরা বাংলা বলতে বা শুনে বুঝতে পারেন কিন্তু লিপির সঙ্গে পরিচয় না থাকায় বাংলা সাহিত্যের রস আস্বাদনে বঞ্চিত। তৃতীয় গোষ্ঠীতে আছেন যে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েত ারাওস্কুলেই ংরাজিও হি ন্দিরম াধ্যমে পড়াশুনাক রায়ব াংলালি পির সঙ্গে পরিচিত নন। এঁদের আকৃষ্ট করতে বাংলা লিপির পরিবর্তে দেবনাগরী লিপির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য রচনার কথা এঁরা চিন্তা করছেন।

প্রথম দর্শনেই মনে হবে অতি উত্তম প্রস্তাব। বদ্ধ জলাশয় থেকে সাহিত্যের ত্রিধারা তিনদিকে প্রসারিত করে তার বহমানতাকে আরও সজীব করার চেষ্টা।

কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বিতর্কের সূত্রপাত হবে। প্রথমত নূতন পাঠকসমাজকে অনেকগুলি শর্ত পূরণ করতে হবে। তাঁদের বাংলা বলা ও শোনায় সমর্থ ও সাহিত্যমনস্ক হতে হবে। বাড়িতে সাধারণ কথা বলা এক, আর সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য ভাষাটা বোঝা আর এক। আর সবচেয়ে হাস্যকর এই তৃতীয় শ্রেণী।

যারা বাংলা ভোলবার জন্যেই এই ভাষাটিকে তাদের পাঠ্যতালিকা থেকে নির্বাসিত করেছেন।তঁারাস াহিত্যপিপাসুহ লেবি দেশীস াহিত্যব াই ংরাজিতেঅ নূদিতব াংলা সাহিত্য পড়বেন। দেবনাগরী লিপিতে লেখা বাংলা সাহিত্য তাদের কোনও রকম আকর্ষণক রবেব লেঅ ামারম নেহ য়ন া।ব াকি যস্বল্পস ংখ্যক পাঠককূলঅ াছেন (যদি ধরেই নিই আছেন) তাহলে তাদের জন্য কত সাহিত্য রচনা দেবনাগরী লিপিতে রূপান্তরিত করবেন? আপনাদের নির্বাচিত রচনার ওপর নির্ভর করে তাদের থাকতে হবে, তার বাইরে ঐ বিশাল সাহিত্যসম্ভার তাদের অধরাই থাকবে। এর জন্য যে বিপুল শ্রমের ও অর্থের অপব্যয় হবে তার মাশুল কে দেবে? এতে বাংলা সাহিত্যের প্রসার কতটা হবে জানি না, তবে হিন্দির আগ্রাসী ভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের ওপর কিছুটা জমিদখলের মত ব্যাপার এসে যাবে।

আমি চিন্তাশীল গবেষক নই। সাহিত্যপ্রেমী সাধারণ এক গৃহবধূমাত্র। আমার এই সীমিত চিন্তাভাবনার ফলে যা মনে হয়েছে তাই ব্যক্ত করলাম।

অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বালিগঞ্জ

সংসদ
-এর বই

শ্যামল চক্রবর্তী
ঐতিহ্য উত্তরাধিকার ও বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র ২২৫/-
বিস্মৃতপ্রায় বিজ্ঞান সাধক চূণীলাল বসু ১৮০/-

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
ঠাকুর বাড়ির কথা ১২০/-

সমীর সেনগুপ্ত
রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন (যন্ত্রস্থ)
রবীন্দ্রসূত্রে বিদেশিরা ৮০০/-

মনোরঞ্জন গুপ্ত
রবীন্দ্র চিত্রকলা ২৫০/-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতাঞ্জলি ১৭০/-
(মূল পাণ্ডুলিপির facsimile সংস্করণ)

ড. রাধাগোবিন্দ মাইতি
পরিবেশ ও উৎপাদন রক্ষায় জৈব কৃষি ৫০/-

প্রোজ্জ্বল শঙ্কর সেন
সাদা হলুদ বাঘ ১৫০/-

গোষ্ঠ ন্যায়বান
কেন খাব সবজি ৫০/-
বাজার থেকে কী সবজি কিনবেন,
কেন কিনবেন, কীভাবে খাবেন, কেন খাবেন?
উত্তর জানতে পড়ুন এই বই।

গোষ্ঠ ন্যায়বান
গাছ বাঁচলে মানুষ বাঁচে ৮০/-

ডা. শ্যামল চক্রবর্তী
রবি ঠাকুরের ডাক্তারি ১৫০/-

দীপংকর লাহিড়ী
পরিবেশ : প্রকৃতির প্রথম সন্তান ২০০/-
Environment : The First Child of Nature 200/-

Compiled & Edited by : K. Kundu et. al.
Imagining Tagore : Rabindranath and the British Press (1912-1941) 1350/-

Nityapriya Ghosh
In the Company of a Great Man 160/-

Madhusraba Dasgupta
Samsad Companion to the Ramayana 800/-

Samsad Companion to the Mahabharata 1200/-

<u>আমাদের পবিবেশনায়</u>
সতী চট্টোপাধ্যায় ও দেবীরাণী ঘোষ
রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র :
নির্দেশিকা ১ (২০০/-), ২ (২৫০/-)

Compiled & Edited Amalendu Biswas et.al
Rabindranath Tagore : A Timeless Mind 1500/-

সংসদ-এর বই পাওয়া যায় **অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড জুনিয়র,** পার্ক স্ট্রীট ।
স্টার মার্ক ঃ লর্ড সিনহা রোড, সিটি সেন্টার, সাউথ সিটি, মনি স্কোয়ার।
ক্রসওয়ার্ড : এলগিন রোড। **কথাশিল্প :** কলেজ স্ট্রিট

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা - ৯

ফোন : ২৩৫০-৮৬৬৯/৩১৯৫
ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৩৬০ ৩৫০৮
e-mail : ss_samsad@yahoo.in
website : www.samsadbooks.in

Samatat Prakashan : 176
April-June 2013
Volume 44 ❑ Number 3

Annual Subscription : **Institution** : 1 Yr/2 Yrs.-Rs. 190/Rs. 380
Individuals **(by post)** : 2 Yrs/3 Yrs.-Rs. 250/Rs. 380
Individuals **(by hand from office)** : 2 Yrs/3 Yrs.-Rs. 160/Rs. 250

With best compliments from :

METAL ENGINEERING & TREATMENT COMPANY PVT. LTD.

Kolkata

R. N. 18270/69
Price :
₹ 30 per copy

Published, printed, owned by Arghya Kusum Datta Gupta, Kolkata - 700 029
Phone : 2466-5590, Mobile : 9830458933, E-mail : chhabik8@gmail.com ; printed by Ayan Ghosh of UNIMAGE , [Phone : 2533 2956], 10, Roy Bagan Street, Kolkata - 6,